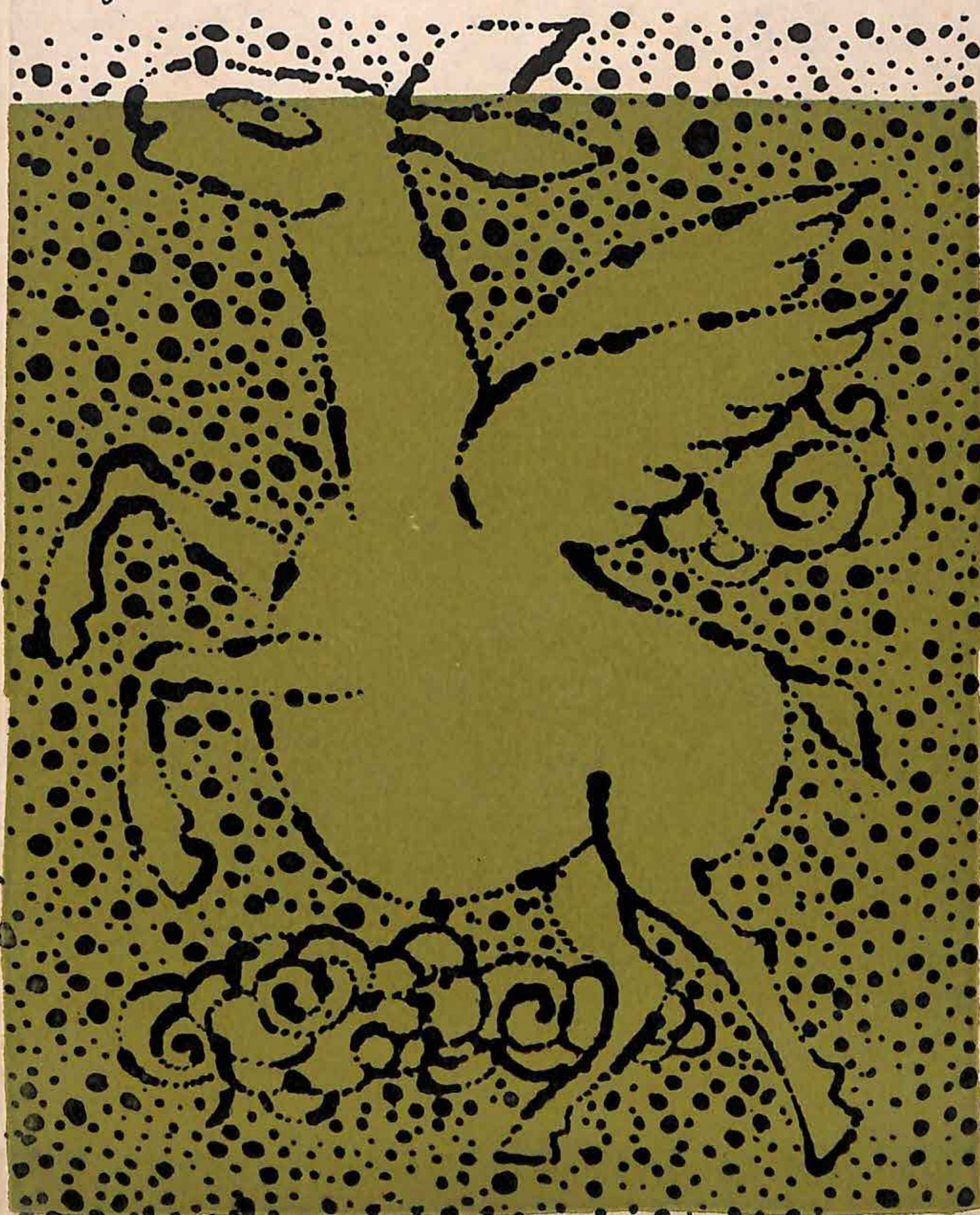
হুয়ান রামোন হিমেনেথ

প্লাতেরো আর আমি

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়



প্লা তে রো আ র আ মি

আন্দালুশি এলিজি ১৯০৭-১৯১৬

হুয়ান রামোন হিমেনেথ ১৮৮১-১৯৫৮

প্লাতেরো ঈ ইয়ো

এলেহিয়া আন্দালুথা ১৯০৭-১৯১৬

মূলের উৎসর্গ

আগুয়েদিল্লা

দেল সোল মহল্লার সেই

গরিব পাগলি মেয়ে

যে আমায় দিত মালবেরি আর কার্নেশনফুল

তার স্মৃতির

উদ্দেশে

হুয়ান রামোন হিমেনেথ

প্লাতেরো আর আমি

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
অনুবাদিত

ভারত বুক এজেন্সি

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯৫ মে ১৯৮৮

ভেতরের ছবি
গণেশ পাইন

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশক
মোহিত বসু
ভারত বুক এজেন্সি
২০৬ বিধান সরণি
কলকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রক
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বেরা
এস. এন. প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৬ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

দশ টাকা

উৎসর্গ

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়জনেষু

সূচীপত্র

অনুবাদকের ভূমিকা

প্লাতেরো, আর কবি

লোহায়-রুপোয় গড়া চাঁদনিরঙের ছোটো একটা গাধা— মনকাড়া একটা ছেলের মতো, পশমি-রোঁয়া ভর্তি নরমতরম যেন একটা পশুপুতুল। এই হল প্লাতেরো। ছেলেদের খেলার, হুড়বাজির সঙ্গী, তার পায়ের ফাঁক পেটের তলা গলে খুশিতে ঘুরতে থাকে বাচ্চা মেয়ে— প্লাতে-রো— প্লাতে-রোন— প্লাতেরি-লো— কত ডাকে যে ডাক দিয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। প্লাতেরো পাল্লা দৌড় ছুটছে তাদের সঙ্গে সমান করে, মুখ বুজে সইছে হাজারটা নষ্টামি-দুষ্টুমি, কাউকে পিঠে চাপিয়ে চলতে গিয়ে খেয়াল রেখেছে পড়ে না যায় খুদে চড়নদার। বড়োদের দলে সে মেলে না যদিও পাছ নিয়ে যেতে যায় বড়োর দলেও। আসলে ছেলের-বুড়োর সবার জন্যে বন্ধুতায় ভরপুর হয়ে আছে— যত লোকজন, সোঁতানদী, প্রজাপতি, রোদের আর ফুলের, পাখির, কুকুরদের, ডালপালা আর তার জানলায় ভেসে ওঠা বুদ্‌বুদ আলোর ফোঁটা— সব্বার। এমনি শাদা, বুঝমান, আর গাঢ় স্বভাবের— শান্ত, বিষণ্ন, কবি বলছেন, তার ঠিক-ঠিক বর্ণনা করতে হলে সে হয় বসন্তের রোদে-রঙে মাখা একটা মধুর গল্পের মতো।

শ্লথ অনুদ্বেজ দিনের পরে দিন মফস্বল শহরের। মাঠ আর গ্রাম আর টিলা আর জ্বালানিগাছের বন আর তাঁবা-খাওয়া নদী আর নীল টানা সাগরের দাগ— প্লাতেরো পায়ে পায়ে যাচ্ছে হলদে গোলাপি বেগনি ধরে ধরে ওঠা আলোর ভেতর দিয়ে, সে আর তার একা অনন্য কবি। ঘরবাড়ি গির্জা বস্তি পাড়া বেদের টোলা জাহাজির জটলা হাঘরে ছেলেদের হুটোপাটি— কলশব্দ আলগা হয়ে হয়ে আসে পেছনে, তপ্ত গন্ধ ওঠা গ্রামের পথ, ছেঁড়া-টুকরো আঙুরবাগ আর পাইনের ছায়া, শুকনো উঁচাই মাঠ, নিরালা পাথুরে রাস্তা, আর সবজে ফটিকের মতো একটানা আকাশ— ক্রমে ক্রমে প্রদোষরাত্রির কিরণ জড়ানো বিশাল একখানা স্বপ্নের ভেতরে হাওয়াস্রোতের মতো বেজে উঠছে হালকা দড়বড়ি। যেতে যেতে কবি কথা বলছেন মনে মনে সারা পথ, যেন অলৌকিক একটা পশুপ্রাণীকে অছিলা করে ভেতর থেকে উঠছে ভাব দুঃখ আশা আর স্মৃতি— চারি ধারের বিজড়িত মমতার মাঝখানে তাঁর নিজের সঙ্গে নিজের নিভৃত স্বগত কথা।

বোর্দো আর মাদ্রিদের আরোগ্যবাস থেকে বাড়ি ফিরে ১৯০৫-৬ থেকে ১২-১৩র মধ্যে জিরিয়ে-থিতিয়ে লেখা প্লাতেরোর দুঃখগাথা— ১৩৭টি লেখা সর্বমোট, ১৯১৫ ও ১৯১৬র সংস্করণে আরো দুটি যোগ হয়। 'প্লাতেরো'-গাথার উপনাম

'আন্দালুশি দুঃখগাথা'। দক্ষিণ আন্দালুশিয়ার খাড়ি-মুখের একখণ্ড অনুচ্চ নেপথ্য মফস্বল, তার রোজদিনকার জনযাত্রা আলোহাওয়া আর প্রকৃতিরূপে জোড়া হয়ে হিমেনেথের অস্বচ্ছ-সরল গদ্যলিরিকমালায় স্বচ্ছন্দিত হয়ে উঠেছে। প্লাতেরোর এক-ভাগ হয়ে আছেন এ লেখার 'আমি'— নিমগ্ন, নিঃসঙ্গ, ঘটনাবর্ত থেকে সরে থাকা, শিল্পায়ন-রাজনীতি-প্রগতিতে নিস্পৃহ, স্ব-তন্ত্র-গর্বিত এক কবি— প্রথম জীবন-পর্বের লভ্যটুকু নির্ণয় করে নিতে এসেছেন নির্জনে ব্যবধানে। হিমেনেথের তখনো-পর্যন্ত-কবিতার যাবতীয় পাওনা বিনিয়োগ করে লেখা 'প্লাতেরো'র এই বই। উল্লেখযোগ্য, প্রথম পর্বের লেখা খসড়া-লেখা বলে পরে খারিজ করতে চেয়েছেন কবি, এক 'প্লাতেরো' বাদে।

নিজেতে ভরে থাকা, পরিবদ্ধ, যেন চারি পাশের জীবনগুঞ্জনের তাপ ছুঁয়ে ফিরছে একজন— এক দিক থেকে আর দিক। একটা পশুপ্রাণী, ফুলপাতাপাখির মতো ছেলেমেয়েরা, আর আঁচহারা চেঁচামেচি-আলোড়ন চার দিককার, আর অ-লৌকিক আকৃতি বয়ে ফেরা একটা লোক চেয়ে মাঝখানে— এই হল 'প্লাতেরো'র জগৎ। তাও যদি কোথাও খোঁচা জেগে থাকে, সারা লেখা ভর্তি কবি ক্ষান্তি ীন আরো মধুফুল আর ঝরাপাতা আর অস্তগোধূলির রঙে রঙে ছেয়ে দিয়েছেন। মানুষ, বা আকাশ— কাউকে ভুল হয় না একমুহূর্ত।

একটা আগে-যাওয়া ছায়া হয়তো আছে প্লাতেরোর পূর্বগামী। সেও লা মাঙ্কার পথে ঘোরা এক নাইট আর তাঁর বাহন— তার গল্প। আরেক অবিস্মরণীয় বিশ্বসাহিত্যের ওই ঘোড়া রোসিনান্তে। নাইট চলেছেন ঘোড়ার মর্জি-পথে। আপ্তজনপদ খুলে খুলে যাচ্ছে চলার দু ধারে। একটু তফাত আছে 'প্লাতেরো'র সঙ্গে। অকুতো নাইট চলেছেন দেশজোড়া অন্যায়ের কিনারা করতে, আর অভাবিত রোমাঞ্চের প্রত্যাশা নিয়ে সারা পথ। কবি ফিরছেন পাওয়া সামিগ্রিকে ফিরে পেতে পেতে, আস্বাদ করতে করতে। একটু মিলও আছে। ডন কিহোতের মতো উপহাস্য নন কবি। কিন্তু পিনিতোর চাইতেও বোকা, লোকে জানে— পিনিতো, যাকে হাঘরে ছেলেরাও ঢিল ছুঁড়ে খেপাতে খেপাতে ছোটে পেছনে। হাওয়াকলের বিরুদ্ধে কবির লড়াই নেই, কিন্তু অমানুষ যন্ত্রপ্রতাপের বিরুদ্ধে আছে তীব্র বিমুখতা। 'প্লাতেরো'র লেখা পড়তে পড়তে একএকবার মনে হয়, তিনশো বছর পর ফের বুঝি লা মাঙ্কার পথ ধরে চলেছে অসহায় সেই বীরপশু, আর তার স্বপ্নার্ত আসোয়ার।

হিমেনেথ নিজেকে জ্ঞান করতেন অভিজাত দুনিয়ার মানুষ বলে— বংশগত নয়, সে হল পুরোনো কৃষিভিত্তি সমাজসংস্কৃতির আরিস্তোক্রাথিয়া। সত্য আর দিব্যের

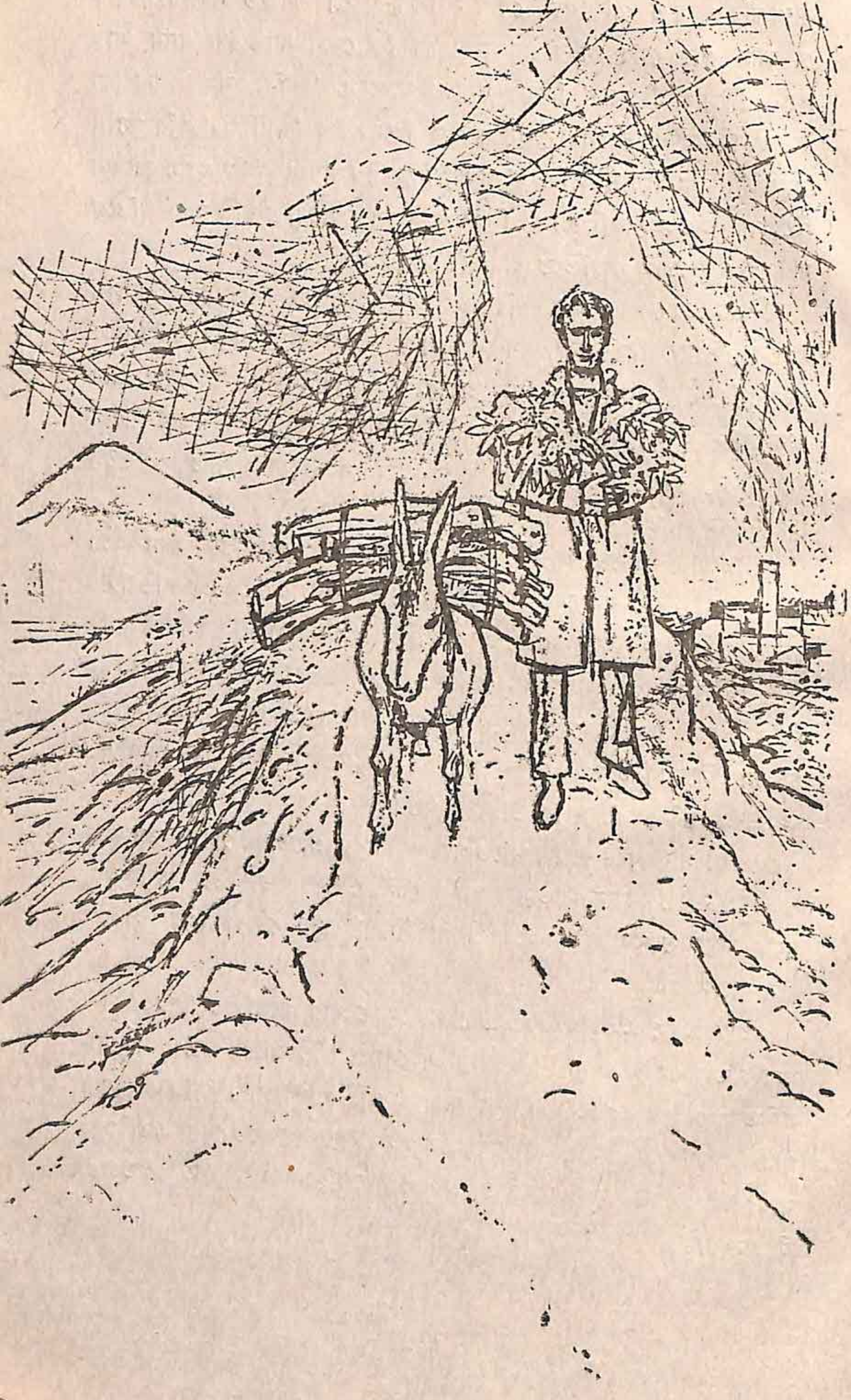
সাথে যার একমাত্র বোঝাপড়া, সে কি শিল্প-প্রকল্পে উপক্রত সময়ের কেউ? যে জ্ঞান আর বোধ কবির আকাজ্ক্ষা সে কি মেলে ব্যক্তিতন্ত্রী ধ্যান আর কল্পনা বিনে? হিমেনেথ নিজের কথাতে বলেছেন, 'আমি হলুম কল্পনাপ্রবণ স্বৈরতন্ত্রী' (দ্র° এইচ. আর. হেইস-অনূদিত হিমেনেথের 'অ্যারিস্টোক্রেসি অ্যাণ্ড ডেমক্রেসি' এবং 'হিরোয়িক রিজ্‌ন্' প্রবন্ধ, 'সিলেক্টেড রাইটিংস্ অফ হুয়ান রামোন হিমেনেথ' ১৯৫৭য় সংকলিত)। হিমেনেথ আরো বলেছেন, প্রকৃতি আর ঐতিহ্যে যার মূল নেই তেমন সংস্কৃতিতে তাঁর রুচি নেই।

হিমেনেথের লেখার যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন তাঁর লেখায় স্থান আর কাল অঞ্চলে-ইতিহাসে নির্ভর নয়, সে হল মহাবিশ্ব ও মহাকাল, স্পেস্ আর ইটার্নিটি (এস্‌পাথিয়ো, এতের্নিদাদ)। এক 'প্লাতেরো'র বইখানি তাঁর ছেলেবেলার, আর প্রথমযৌবনবয়সের অপরোক্ষ লোকজনঘরমাঠগ্রামদৃশ্যপ্রকৃতিতে সমাকুল হয়ে আছে। বারদুনিয়ায়, বৃহৎ জীবনে নিষ্ক্রান্ত হবার পরে সে ছাইচাপা স্মৃতি হয়ে রইল চিরদিনকার। তাই এ বই আন্দালুশি এলিজি।

প্লাতেরোর কথাতে আরেক গাধা আর তার বীরসোয়ারির কথা এসে পড়ে— সে হল স্টিভ্‌ন্‌সনের মডেস্টাইন, দক্ষিণ ফ্রান্সের সেভেন-এ অভিযানের বাহন, পঁয়ষট্টি ফ্রাঁ আর এক গেলাস ব্র্যাণ্ডি-মদে কেনা গাধা। দুর্গম পাহাড়ি পথে অভিযাত্রী লেখক চলেছেন তাকে ভরসা করে, তার সঙ্গে তাঁর চলাবলা বিবেকী ইংরেজি সদাচারের দৃষ্টান্তে বাঁধা, তবু জায়গায় জায়গায়, তাকে বলতে-চালাতে, নিজের নিষ্ঠুরতায় লেখক নিজেই মুষড়ে পড়েছেন। রঙিন রোমাঞ্চের বই, তার পশুটি কেবল অবাধ্য ভারবাহী পশু।

সে জায়গায় কবির পরমমমতাতে গড়া আমাদের প্লাতেরো, যেন সে রূপকথার পুতুলপশুটি। লোকজন সোঁতানদী পাখির ফুলের রোদের প্রজাপতিদের সবার বন্ধু, সবার জন্যে ভরপুর হয়ে আছে ভালোবাসায়। তার জোড়া আর কাউকে মনে পড়ে না।

'প্লাতেরো' ছোটোদের বই, শ্রেষ্ঠ ছোটোদের লেখার মতো বড়োদেরও বই। জনপ্রিয়তায় এর তুলনা ল্যুয়িস ক্যারল, 'এলিসে'র চাইতে আরেক ভাবের রহস্যে-কবিতায় মোড়া এর লেখা। বহু ভাষায় প্রায় পৃথিবীব্যাপী আজ এ বইয়ের পাঠক। তার আধখানারও কম বাংলাতে এই বই হয়ে বেরোতে পেল এতদিনে। তার জন্য ভারত বুক এজেন্সির অধ্যক্ষ শ্রীমোহিত বসুর কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।



ফিরে আসা

প্লাতেরো

পশমরোমশ ছোট্ট তুলতুলে এই আমাদের প্লাতেরো ধরলে মনে হয় কী নরম, যেন তুলোয় গড়া, একটা হাড় নেই শরীরে। শক্ত বলতে খালি শিলাআয়নার মতন চোখদুটো, কষকষে কালো যেন দুটো ফটিক-ভোমরা।

ছেড়ে দি, দিলেই ছুট্টে নেবে যায় মাঠের মধ্যে, গোলাপি আশমানি জরদাহলুদ ছোটো ছোটো ফুলের গায়ে নাক ঘষতে থাকে— আলতো, প্রায় না ছুঁয়ে। নরম গলা করে ডাক দি—'প্লা তে রো ?' খুশিতে টগবগিয়ে এসে পড়ে ছুটতে ছুটতে— যেন স্বপ্নআতুর এককলি সুর বাজতে বাজতে আসছে ঝমঝম করে।

যা দেব তাই খেয়ে নেবে। তবে ভালোবাসে বলতে জামির-লেবু, বাদামি ছোপ ধরা মনাক্কাআঙুর, টসটসে মধুর বিন্দু মুখে ফেটে পড়ছে জাম-ফলসার গোছা।

ছোটো একটা ছেলের মতন নরমতরম মনকাড়া ও আমাদের, তেমনি আবার পাথরলোহার মতো শক্তসমর্থ। অলিগলি শহরতলি ওর পিঠে চেপে যখন যাই রবিবার দিনে, ভালো বেশবাস, আলসে পায়ে ঘুরছে এমনি সব গাঁয়ের লোকেরা নিরীক্ষণ করে দেখতে থাকে ওকে দাঁড়িয়ে।

দেখেছ, যেন লোহা দিয়ে গড়া।

লোহা, বটেই তো। লোহা আর চাঁদনি রুপোয় মেলানো।

শাদা প্রজাপতি

রাত পড়ে এল, বেগনি কুয়াশাময় রাত। সবজে আর মুগা রঙের আভা আলো এখনো লেগে রয়েছে গির্জার মিনারের পেছনে। রাস্তা উঠে গেছে চড়াই পথে ছায়ায় আর ছোটো ছোটো ঘন্টাফুলে, ঘাসের গন্ধে গানের সুরে ক্লান্তি-বাসনায় জড়ানো। হঠাৎ কালো-মতন একটা লোক টুপি আর ছড়িসুদ্ধ— চুরুটের মুহূর্ত-আগুনে লাল হয়ে উঠেছে কুচ্ছিৎ মুখটা, পাশের ডাঁই করা কয়লার বস্তায় ঢাকা পড়ে যাওয়া ভাঙাচোরা একটা ছাউনি থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে প্লাতেরো।

'কী আছে?'

'দেখে যাও নিজেই··· শাদা প্রজাপতি।'

ছোটো ঝোড়াটার ভেতর ছড়ির লোহার আগা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখতে থাকে লোকটা, বাধা দিই না। জিনে বাঁধা থলির মুখটা খুলে দি, উকিঝুঁকি দিয়েও কিছু দেখতে পায় না। স্বপ্নের রসদ নিয়ে আমি পার হয়ে যাই, অবারিত, চুঙ্গিদারকে একটা পয়সাও মাশুল না দিয়ে।

গোধূলিআলোয় খেলা

গোধূলিপ্রদোষের মাঝ দিয়ে প্লাতেরো আর আমি যাচ্ছি— ঠাণ্ডায় কাঁটা দিয়ে উঠছে গায়ে, বেগনি আবছায়া জমা নোংরা সরু যে রাস্তাটা গিয়ে পড়ল মরা সোঁতার মুখে, দেখি বস্তিঘরের ছেলেমেয়েগুলো খুব খেলছে মিলে— সাজা-সাজা খেলছে, একজন ভয় দেখাচ্ছে একজনকে, ভিখিরি সেজে মাগছে, একজন একটা ছালামুড়ি দিয়েছে মাথায়, একজন হাতড়ে হাতড়ে চলছে আর চেঁচাচ্ছে— দে খ তে পা চ্ছি না— একজন লেঙচে চলেছে খোঁড়া সেজে···

হঠাৎ ছেলেমানুষি খেয়ালে— কেন না জামাও পরেছে জুতোও পরেছে— ওদের মায়েরা, মায়েরাই জানে কী উপায়ে, খেতেও দিয়েছে তো জুটিয়ে, অতএব হঠাৎই ভেবে ফেলেছে ওরা সব রাজপুত্র-রাজকন্যা।

'এই জানিস, আমার বাবার একটা রুপোর ঘড়ি আছে।'

'আমাদের ঘোড়া আছে, জানিস ?'

'আমাদেরও বন্দুক আছে।'

ভোরবেলাতে ঠেলে তুলবে যে ঘড়ি, যে বন্দুকের গুলিতে খিদে মরে না, যে ঘোড়া নিয়ে যায় অকূল দারিদ্র্যের দেশে···

হাত-ধরাধরি করে গোল হয়ে নাচতে লাগল তারপর সবাই মিলে। অন্ধকারের মধ্যে রোগা-দুবলো গলাতে চেঁচিয়ে উঠল ছোট্ট একটা মেয়ে— মিশছায়ার ভেতরে তরল ফটিকের সুতোর মতন ঝিলিক দিয়ে উঠল রাজকুমারীর সুরেলা গলা

ওরে, আমি ওরি-রাজার
ফুলের কুঁড়ি বিধবা রে—
বালিকা-বৌ বিধবা রে, ও রে···

ঠিক, ঠিক ! গা, স্বপ্ন গেয়ে চল্‌, গা, হাঘরে ছেলেমেয়ের দল। কদিন বাদেই, যৌবনের মঞ্জরী মুখিয়ে উঠবে যখন, বসন্ত ভয় দেখিয়ে যাবে তোদের শীতের ভিখিরি-সাজে সেজে।

'চল যাই, প্লাতেরো—'

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মস্ত, সুগোল, অমল ফটিকের মতন চাঁদ। ঘুমপাওয়া মাঠের কিনারাতে ফলসাকাঁটার ঝোপে ঝোপে কালো কিমাকার কতকগুলো ছাগল। কেউ যেন নিঃশব্দে গা ঢাকা দিল আমাদের সাড়া পেয়ে··· পাথরপাঁচিলের গায়ে বিশাল এক বাদামগাছ, ফলে-কুঁড়িতে-চাঁদের-আলোয় তুষারার্ত, চুড়ো মিলিয়ে দিয়েছে এক শাদা মেঘের মধ্যে, চৈতি তারার বুটি ছিটোনো লম্বা পথটুকু দিয়েছে ঢেকে। ভেসে আসে কমলালেবুর তীক্ষ্ণ গন্ধ··· আর্দ্র, স্তব্ধ চারি ধার··· ডাইনির শুঁড়ি।

'কী ঠাণ্ডা··· পড়েছে রে··· প্লাতেরো।'

প্লাতেরো চলেছে দড়বড়িয়ে, জানি নে আমার ভয়ে না ওর নিজের, ক্রমে নেবে পড়েছে নদীর মধ্যে, পা তুলে দিয়েছে একেবারে চাঁদের ওপর, দিয়েছে তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে এলোমেলো করে। যেন ঝাঁক ঝাঁক স্বচ্ছ ফটিকের গোলাপ তাকে থামাতে গিয়ে ক্রমাগত জড়িয়ে যাচ্ছে তার পায়ে পায়ে।

শেষে উঠে পড়েছে প্লাতেরো নদীর আর-পাড় বেয়ে, যেন ওকে কেউ পেরিয়ে যাবে সেই ভয়ে পেছন পায়ে তুরিৎ-বেগ উঠিয়ে, এতক্ষণে সামনা গাঁয়ের আরামতাপটুকু লেগেছে মনে— যে গাঁয়ে কোনোদিন পৌঁছনো যাবে কি না কে জানে···

কিভাবে গোলাপ ঝরছে চার ধারে দেখ প্লাতেরো, দেখ : নীল গোলাপ, লাল গোলাপ, শাদা গোলাপ, রঙছুট নির্বর্ণ গোলাপ··· মনে হবে গোটা আকাশটা যেন গলে মিলে যাচ্ছে গোলাপের মধ্যে। দেখ, আমার কপাল ছেয়ে গেল, দুটো কাঁধ, আস্ত হাতদুটো, শুধু গোলাপ, গোলাপ··· কী করব এত গোলাপ দিয়ে ?

তোর হয়তো জানা, আমি তো জানি নে এমন সুকুমার এত ফুল কোথার থেকে আসে, রোজ দেখছি গোটা দৃশ্যখানা আরো রেশমের মতন নরম, গোলাপিমধুর, শাদা, নীলিমাকোমল করে তুলছে একটু একটু করে— আরো, আরো গোলাপ— ফ্রা আনজেলিকোর ছবির মতন ঠিক, সেই যিনি হাঁটু গেড়ে বসে আকাশের ছবি আঁকতেন।

মনে হবে সাততলা দেবলোক থেকে গোলাপ ছুঁড়ছে সব ঝলকে ঝলকে। উষ্ণ, হালকা-রঙ-ধরা বরফপাতের মতো ঝরঝর করে গোলাপ ঝরছে মিনার-চূড়োতে, ছাদের ওপর, গাছের মাথায়। দেখ, যেখানে যেটুকু রুক্ষ কঠিন সব বদলে সুন্দর হয়ে উঠল ফুলের আভরণে। গোলাপ, গোলাপ, গোলাপ, শুধু গোলাপ···

দেখ রে প্লাতেরো, মনে হচ্ছে আনজেলুসের ওই ঘণ্টা বাজাতে বাজাতেই রোজদিনকার সব বলসামর্থ্য ক্ষরে ক্ষয়ে গেল আমাদের, আর এই দেখ, খুব ভেতরঅভ্যন্তর থেকে আরেক শক্তি জেগে উঠছে— অকল অবিচল, দেখ, জেগে উঠছে যেন করুণার প্রস্রবণের মতো, গোলাপগুচ্ছের ফাঁকে ফাঁকে এতক্ষণে জলজলিয়ে উঠেছে যত তারা— সব-কিছুকে ঠেলে তুলছে ওইখানে। গোলাপ, আরো গোলাপ··· তোর চোখদুটো প্লাতেরো তুই দেখতে পাচ্ছিস নে, ভীতুর মতন তুলে আছিস আকাশমুখো— ও দুটোও যে গোলাপ রে দুটো।

মাঠে নেবেই খুঁড়োতে শুরু করেছে। নাবতে হল পিঠ থেকে।

কী হল রে, প্লাতেরো?

ডান আগুপায়ের খুর একটু তুলেছে প্লাতেরো— ব্যাঙ একটা। পায়ের ভর দেয় নি তার ওপরে, ইশারায় দেখাচ্ছে রাস্তার তাতা বালিতেও ছুঁই-না-ছুঁই আলগা তার খুর।

সন্দেহ নেই ওর ডাক্তার বুড়ো দারবোনের চাইতে ঢের যত্ন করে হাঁটু থেকে মুড়ে ধরলুম ওর পা-টা, লাল ব্যাঙটাকে দেখতে থাকি তারপর। শক্ত, কমলাগাছের একটা লম্বা সবুজ কাঁটা— ছোট্ট পান্নার ছুরির মতন দেখতে— বিঁধে আছে গোল মাথাটায়। প্লাতেরোর যন্ত্রণার ছোঁয়াচ লেগে আমারও কাঁপুনি উঠতে থাকে, কাঁপতে কাঁপতেই কাঁটাটা উপড়ে তুলে বেচারাকে ছেড়ে দিলুম গিয়ে হলদে নাল ফোটা স্রোতের মধ্যে— যাতে ধারাজল তার লম্বা ঝকঝকে জিভ বুলিয়ে বুলিয়ে চেটে নিতে পারে ক্ষত।

তারপর এগিয়ে চলি ফের ধলারঙা সমুদ্রের দিকে— আমি আগে, ও পেছনে, তখনও খুঁড়োচ্ছে, আর মাথা দিয়ে আলতো ঠেলা দিতে দিতে আসছে আমার পিঠে।

তাবেলা

দুপুরবেলাতে যখন প্লাতেরোকে দেখতে যাই, দেখি ওর নরম রুপোলি পিঠে এতখানি একটা সোনার পটি জ্বালিয়ে তুলছে মধ্যদিনের একটা কিরণরশ্মি। ওর দেহের নীচে, সব-কিছুকে পান্নার রঙে রঙিয়ে তোলা আবছায়া সবুজ যে কালো জমিটুকু, দেখি তার পরে আগুনের ঝকঝকে টাকা বর্ষে পড়ছে জীর্ণ চাল চুঁয়ে।

প্লাতেরোর পায়ের ফাঁক গলে গলে খেলছিল ডায়না, নেচে-কুঁদে ছুটে এল আমায় দেখেই, সামনা-থাবাদুটো তুলে দিল সোজা বুকে, আমার মুখে ওর গোলাপি জিভটা চেটে দিতে খালি মুখিয়ে আসছে। জাব-দেয়া গামলার উঁচু কাঁদার ওপরে বসে ছাগলিটা মেয়েলি স্বভাবমতো পলকা মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে আমায় দেখতে থাকে কৌতূহল করে। এর মধ্যেই, ঢুকতে-না-ঢুকতেই, প্লাতেরো আমায় অভ্যর্থনা করে উঠেছে চড়া গলায়, এবারে দেখি তার সমস্ত সানন্দ গায়ের জোর খেলার আবেগে একজোট করে দড়ি ছিঁড়ে মুক্ত হয়ে সে ছুটে যেতে যায়।

আকাশশীর্ষের ঝলমল মণিমানিক্য ফুঁড়ে ঢুকে আসতে থাকে বেড়ার ঝরকা গলে, সেই ফাঁকে আমিও এখানকার এই বন্ধুদের ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যে একটা রশ্মিকিরণের ধাপ ভেঙে উঠে যাই আকাশে। তখুনি ফের পৃথিবীতে ফিরে এসে দাঁড়িয়েছি একটা পাথরপৈঠায়, চেয়ে আছি মাঠপ্রান্তরের বরাবর।

দুপুরআলোর সুবাসী আচ্ছন্ন বন্যায় সাঁতরে চলেছে সবুজ দৃশ্যনিসর্গ, রুক্ষ দেয়ালের পাড় বাঁধা ঝকঝকে নীলের পটে একটা ঘণ্টা বেজে উঠল সুরেলা আওয়াজ তুলে।

রাস্তার ওপারের বাড়ি

ছোটোবেলায় রাস্তার ওইপারের বাড়ি বলতে একটা ভীষণ জাদু ছিল রে প্লাতেরো। প্রথম তো রিবেরা স্ট্রিটে পানিপাঁড়ে আরেবুরার সেই ছোট্ট বাড়িটা, দক্ষিণের উঠোনটায় সারাদিন ধরে সোনালি রোদ, বাগানের পাঁচিলে উঠলেই দেখা যায় ছবির মতন ওয়েলভা-র দৃশ্য। একটু যদি যেতে পেতাম, আরেবুরার মেয়ে— তখনই মনে হত বেশ বড়ো আর এখন তো বিয়েই হয়ে গেছে কাজেই তখনকার মতনই মনে হয়— সে আমায় দিত মিষ্টি ডাঁশা পেয়ারা আর চুমু··· পরে, হ্যয়েভা স্ট্রিটে যখন গেলাম, তারপর সেই কানোভাস, তারপর গেলাম ফ্রে হুয়ান পেরেৎ— সেখানে সেই সেভিল্যের মিঠাইওলা ডন হোসে-র বাড়ি— মনে পড়ে হলদে চামড়ার বুটজুতোজোড়া তার চকচক করছে চোখের ওপর! উঠোনের শতকী গাছ ভর্তি ঝুলিয়ে রেখেছে ডিমের খোলা, দোরের পাটে রঙ-করা ক্যানারিহলুদের গায়ে নীল নীল আঁজি— মাঝে মাঝে আসত আমাদের বাড়িতে, বাবা তাকে টাকাকড়ি দিতেন আর বাবাকে সে বলতে থাকত জলপাইবাগানটাগানের কথা··· ডন হোসে-র বাড়ির ছাদের সেই বুড়ো মেহেদিগাছটা ছেয়ে আছে ভর্তি চড়ুইপাখিতে— বারান্দা দিয়ে দেখছি, ছোটোবেলার কত স্বপ্ন আমার দোল খেয়ে উঠেছে যে সেই দোলাতে। দুটো ছিল মেহেদিগাছ ওখানে— একটা যেটা দেখা যেত বারান্দার থেকে রোদে বাতাসে দুলছে, আরেকটা ডন হোসে-র উঠোনে দেখতাম, একেবারে মূল থেকে দুটোকে কোনোদিন এক করে দেখতে পেলুম না।

স্বচ্ছ সন্ধ্যেবেলায়, বর্ষার দুপুরে-- রোজদিনকার প্রত্যেকটা প্রহরলহমার একটু বদল হলেই মনে হত যেন ভীষণ একটা টান আছে বাড়িটাতে— আমাদের পাঁচিলের জালি দিয়ে, জানলা দিয়ে, বারান্দা দিয়ে দেখছি রাস্তার স্তব্ধতার ভেতর ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওপারের সেই বাড়ি।

ছোটো হাবা ছেলেটা

সান হোসে সড়ক ধরে যখনই ফিরি দেখি দোরগোড়ায় ঠিক বসে আছে হাবা ছেলেটা, রাস্তা দিয়ে লোকের আনাগোনা দেখছে। হতগরিব ঘরের বাচ্চা, না পেয়েছে কোনো ছিরি না পেয়েছে কথা-বলার ক্ষমতাটুকু অবধি, নিজেকে নিয়ে নিজে পরম খুশি, তবু দেখলে মনখারাপ লাগে, মায়ের সর্বস্ব, আর অন্যদের কিচ্ছু না।

শাদা সড়ক মুড়িয়ে বয়ে গেল একদিন পাপ কালো দুর্যোগের ঝড়, দেখি দোর-গোড়াতে ছেলেটা নেই। শূন্য চৌকাঠের পরে একটা পাখি বসে কিচমিচ করছে নিজের মনে। আমার মনে পড়ল কুরোসের কথা, বাপের চাইতেও বেশি সে হল কবি, ছেলেকে হারিয়ে খোঁজ করতে গেছে গালিসিয়া প্রজাপতির কাছে।

'সোনা মোড়া ডানার প্রজাপতি, বলতে পারিস…'

বসন্তের দিন এসে গেল। আবার মনে পড়ে গেল হাবাগোবা ছেলেটার কথা— সান হোসে সড়ক থেকে সোজা যে চলে গিয়েছিল দেবতাদের দেশে। ফোটা গোলাপের মাঝখানে ছোট্ট পিঁড়িটাতে সে গিয়ে বসে আছে, আবার চোখ খুলে চেয়ে চেয়ে দেখছে পুণ্যবন্ত মানুষরা চলেছেন সব সোনার আলোর সার দিয়ে।

পাহাড়চূড়ো। নিজের হাতে ছোঁড়া ফটিকের হাজার বর্শায় বিদ্ধ হয়ে সমস্ত শিরা-উপশিরা দিয়ে ফিরোজা গোলাপি রক্ত বমন করছে অস্তসূর্য। সেই জলৎগরিমার সুমুখে বিবর্ণ পাইনবন আবছায়া কপিশ; তৃণমঞ্জরীর কাঁচস্বচ্ছ ফোয়ারার মুখে উজ্জ্বল ভিজে সুগন্ধ একটানা ছড়িয়ে যাচ্ছে শান্ত প্রহর ছেয়ে।

আপ্লুত জর্জর হয়ে দাঁড়িয়ে আছি গোধূলির মধ্যে। প্লাতেরোর চোখদুটো সূর্যাস্তের মণ্ডন লেগে আশোণ-রক্তিম, আলগা পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে ও পুকুরমুখো। লোহিত-বেগুনি গোলাপের রঙে মাখামাখি জল, মুখ ডুবিয়ে দিয়েছে সেই আয়নাতে, ছোঁয়া লাগতেই আয়না ছলছল করে উঠল তরল রঙিন জল হয়ে, দীর্ঘ গলার নলি বেয়ে ভরে ভরে উঠতে লাগল আঁধার-কপিশ ছুটতি জলের ধারা।

কতকালের জানাচেনা সমস্ত, কিন্তু এই মুহূর্তলহমাটুকুর ছোঁয়া লেগে কখন হয়ে উঠেছে আশ্চর্য দ্যোতনাময়। মনে হয় এখন যে-কোনো সময় গিয়ে পড়তে পারি লোকাতীত রহস্যের জগতে— লোকজনহারা ছন্ন ভগ্ন প্রাসাদপুরী, তার পাশে··· নিজেকে নিজে পেরিয়ে চলেছে বিপুলবিসারী ওই যে সন্ধ্যাগোধূলি, যেন অনন্তের ছোঁয়া পেয়েছে এমনি নিঃসীম, শান্তিময়, শব্দাতীত চার ধার···

'চল যাই, প্লাতেরো'।

ফিরে আসা

প্লাতেরো আর আমি ভার বোঝা নিয়ে ফিরছি পাহাড় থেকে: প্লাতেরো বইছে চন্দনকাঠ, আমি লিলিফুলের বোঝা।

এপ্রিলের গোধূলিসন্ধ্যা। পশ্চিমের যা-কিছু ছিল তরল সোনা এখন সে সজল রুপোলি, বড়ো বড়ো রাজ-জুঁইয়ের পাপড়ির রেশমি ছটায় কানাকানি। বিশাল সে আকাশখানা তারপর হয়ে উঠল স্বচ্ছ নীলা একখানা, তারপরে হয়ে উঠল পান্নাপাথর। কাফন-কাপড়ের মতো বিষাদ জড়িয়ে উঠল আমায়।

পাহাড়চুড়োর থেকে শহরের একটা মাত্র মিনার, নীল টালির মুকুট চড়ানো গির্জার সে মাথাটি সেই দণ্ডের নিষ্কলতার মধ্যে আহরণ করে নিয়েছে গগনছোঁয়া এক মহিমা। সেই মুহূর্তটুকুর জন্য সে যেন দূর থেকে দেখা-পাওয়া হিরাল্‌দা··· যেন আকৃতি আমার সেভিলার জন্যে, বিষণ্ণ একফোঁটা স্বস্তি খুঁজে পেয়ে যা তীব্র হয়ে ওঠে বসন্তের দিনে।

ফিরে আসা··· কোথায় ফিরে আসা? কোথা থেকে? কোন্‌খানে? কিসের জন্যে? তবু, যে লিলিফুল আমি বয়ে নিয়ে চলেছি, আসন্ন রাত্রির সন্তজায়মান উষ্ণতার মধ্যে সে যেন আরো গন্ধভার হয়ে উঠছে; যেন আরো বিঁধে পড়ছে সুগন্ধ তার, যেন আরো অস্পষ্ট, অলখফুলগুচ্ছের থেকে বয়ে আসা, যেন সে হয়ে উঠছে কেবল নির্যাস, সুরভিসর্বস্ব, মাদকমাতাল করে তুলছে নির্জন অন্ধকারের একাকার দেহপ্রাণ।

'ওগো আত্মা আমার, ছায়ার ভেতর ফোটা লিলিফুল', আমি বলে উঠি। আর তখুনি হঠাৎ মনে পড়ে গেল প্লাতেরোকে, সোয়ারি হয়েও যাকে ভুলে বসেছিলুম এতক্ষণ— যেন সে আমারই শরীরের একটা অংশ।

দাঁড়া প্লাতেরো। চাস তো চর গে যা ওই ঘাস ভর্তি মাঠের ভেতর। একটুখানি চেয়ে থাকি এই সুন্দর পুকুরটাতে, কতকাল দেখি নি।

দেখ, ঘোলা জল ফুঁড়ে নেবে গেছে কী রকম সূর্যের আলো, পাতালতলার সোনালিসবুজ রূপটুকু যেন আলো করে তুলেছে, সুখে ভোর হয়ে বসে বসে সেই রূপ ধ্যান করছে যেন স্বর্গদেশের শান্তহিম যত শাপলা-শালুকের ফুল। জাজিম পাতা সিঁড়ির মতন ধাপ ধাপ করে আলো নেবে গেছে হাজারঘুরোনো গোলক-ধাঁধায়; স্বপ্নগ্রস্ত শিল্পীর স্ফুরৎকল্পনাতে স্বপ্নপুরাণের যত ইচ্ছেসামিগ্রি ভেসে ওঠে, সব দিয়ে সাজানো জাদুকরের মণিগুহা— বিভ্রমিত হরিণনয়না রানীর লাবণ্য-বিষাদ দিয়ে গড়া অপরূপ সব কুঞ্জবাগান; গোধূলিসমুদ্রের স্তব্ধ জলের ওপর অস্তসূর্যের কিরণ বাঁকা হয়ে পড়ে যেমন দেখায় তেমনি সব ভগ্নদশা প্রাসাদপুরী··· আরো, আরো অনেক, আরো অনেক : সবচাইতে আশ্চর্যতম স্বপ্ন যেমন দেখি, কোথাও কখনো যা ছিল না এমনি এক বিস্মরণের বাগানে— মনে পড়ে যাওয়া যন্ত্রণাভরা লহমাবসন্তের মাঝখানে পলাতকা রূপসীর অফুর আঁচল আঁকড়ে যেন টানছে··· সব বিঘত-ছবির আকৃতি, তবু বিপুল, হয়তো বা দূর বলে বিপুল, চার ধার ছাওয়া সংখ্যাতীত আবেগঅনুভবের চাবিকাঠির মতন— আদিমতম জাদুকরের জ্বরঘোরে দেখা স্বপ্নের যেন সে রত্নকুঠুরি।

জানিস প্লাতেরো, একদিন এই পুকুরটা ছিল আমার প্রাণের বাড়া। ওর দিকে চেয়ে, চাপা অনন্তবিস্ময় ভরা ওর নির্জনতার মধ্যে তিল তিল করে অপরূপ এক বিষে ক্ষইতে ক্ষইতে এইরকম সব মনে হত আমার ভেতরে-ভেতরে। ঘা দিয়ে বাঁধ কেটে খুলে ফেঁড়ে দিত যখন মানুষের ভালোবাসা, দেখতুম ঝলকে ঝলকে বিষরক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে খাল বেয়ে, দেখতুম এপ্রিল মাসের বাধাবন্ধ ঘোচা সোনার পাত জড়ানো দিনপহরের মধ্যে চুপ করে ও পড়ে আছে ল্লানোস নদীটির মতন, শান্ত অমল পূতপবিত্র।

কখনো কখনো দেখি আদিম পাণ্ডুর একখানা হাত ওকে ফের সেই পুরোনো নিঃসঙ্গ সবুজ পুকুরটি করে বুঁদ করে রেখে গেছে ওইখানে ওর বাইরেটাতে— পরিষ্কার শমন শুনে সাড়া দিচ্ছে, 'মধু মিশিয়ে রাখছে দুঃখটুকুনি'— ঠিক যেন শেনিয়ে-র কবিতা : সেই 'আলকিদেসের প্রতি হাইলাস'— মনে আছে প্লাতেরো, সেই যে তোকে পড়ে শুনিয়েছিলুম 'না জেনে, গর্বিত' গলায়।

তোকে বলেছিলুম না প্লাতেরো, মদ হল আমাদের শহরের জীবন? না রে, আমাদের শহরের প্রাণ হল রুটি। গমপেষা আটায় বানানো একখানা পাউরুটি আমাদের এই মোগের, ভেতরটা রুটির তুলতুলে ভেতরকার মতন শাদা, বাদামি নরম সেঁকা ওপরটার মতন বাইরেটা।

দুপুরবেলায়, সূর্য তখন সবচাইতে তপ্ত, আমাদের এই শহর যেন ধুঁয়োতে থাকে, দেখিস, পাইনকাঠের আর তাজাগরম রুটির গন্ধ বেরোতে থাকে গা দিয়ে। গোটা শহরটা যেন হাঁ করে ওঠে। কী বিরাট হাঁ, মস্ত একটা আস্ত রুটি যেন মুখে পুরে দিতে পারে। রুটি হল জীবন। যা দিয়ে খাও— তেলে-মাখমে মাখিয়ে, ঝোলে ভিজিয়ে, চুমুর মধুগন্ধ ছড়ানো মনাক্কাআঙুর, মদ, তরকারি, শুয়োরের মাংস, কিছু না তো শুধু-শুধুই, রুটি দিয়ে রুটি। তাও যদি নয় তো নিরুপকরণ কেবলমাত্র রুটিটা— সুআশার মতন, নয় তো স্বপ্নঅলীকের চাখনা দিয়ে এক-একটা কামড়…

বেকারির কর্মচারি ছেলেগুনো আসতে থাকে ঘোড়া দাপিয়ে, প্রত্যেকটা বন্ধ দরোজার মুখে গিয়ে দাঁড়ায়, ডাকতে থাকে হাততালি বাজিয়ে :

'রুটি! রুটি!'

খালি হাতে ধরা রুটির চাঙাড়ি ; সিকি রুটির আওয়াজ ধপ্ ধপ্ করে পড়তে থাকে বান্-রুটির ওপর, বড়ো বড়ো রুটিগুনো পড়ে গিয়ে রোল-রুটির গায়ে…

আর তক্খুনি লোহার গেট ঝনঝনিয়ে, ভারি দরোজায় দুম্দুম্ করে ডাক আর ডাক— টানা বারান্দা দিয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে কাঙাল ডাকের শব্দরেশ :

'মা গো, একটুকরো রুটি পাই, মা গো!'

লা করোনা-র পাইনগাছ

যেখানেই জিরোতে দাঁড়াই, জানিস প্লাতেরো, মনে হয় লা করোনা-র সেই পাইনতলাটিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। যেখানেই যাই— সে কোনো শহরবসত হোক, কি ভালোবাসা, কি কোনো বৃহৎ গৌরবই হোক— মনে হয় শাদা মেঘের কুচি আঁটা নীল আকাশের নীচে ওরই সেই বিপুল সবুজ ঘেরের মাঝখানটাতে পৌঁছেছি গিয়ে। ও হল আমার স্বপ্নের টালমাটাল রুক্ষ সমুদ্রের ভেতরে আয়ত উজ্জ্বল দিক-দেখানো লাইটহাউস, ঝড়ের মধ্যে বালি-বাঁধা বন্দরের মুখ দেখতে পেলে মোগেরের মাল্লাদের যেমন লাগে, শুরকি-পাথরের যে খাড়াই পথটা ধরে সানলুকারে যায় ভিখিরির দল— তারই মাথার ওপর আমার দুঃখের দিনের উঁচু নিরাপদ আশ্রয়ের মতো ও দাঁড়িয়ে আছে।

এই স্মৃতিনিরাপদের তলাটাতে গিয়ে বসতে পেলেও যে কত বল পাই! এই একটামাত্র যার বাড় বন্ধ হয় নি কখনো, আমি যতই বড়ো হয়ে উঠেছি, দেখেছি দিন-দিন ও আরো বাড়ছে, আরো বাড়ছে। ঝড়ে মচকা-ডাল সব কেটে নিয়ে যায়, মনে হয় আমারই একটা-একটা অঙ্গ কেটে নিয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে হঠাৎ-ব্যথা পেলে মনে হয় লা করোনা-র ওই পাইনগাছেরও গায়ে সে ব্যথা দপ্‌দপ্‌ করছে।

যেমন সাগর, যেমন আকাশ, যেমন আমার এই হৃদয়ের বিসার, 'বিরাট' কথাটা যেন মূর্ত হয়ে শব্দ-রূপ হয়ে উঠেছে ওর মধ্যে। শতাব্দীর পর শতাব্দী একের পর এক কত জাত— আকাশের নীচে, জলের পরে, আমার মন-কেমনের ভেতর, ওর ছায়ায় জিরিয়েছে বসে মেঘমালার দিকে চেয়ে চেয়ে। যখন আমার অবশ ভাবনার মধ্যে আসে-যায় স্রস্ত অযত ছবির পরে ছবি, কিংবা যখন দ্বিতীয় ছবির মতন সব দেখা যায় স্বভাবদৃশ্যের পাশে পাশে, লা করোনা-র ওই পাইনগাছটা দেখি অনন্তের অস্ফুট প্রতিচ্ছায়ার মতন হয়ে উঠছে, আবছায়ার মধ্যে দিয়েও আরো মর্মরিত, আরো বিরাট ; দেখি আমায় ডাকছে— সারা জীবনের যাত্রার শেষে সত্য অনন্ত মোক্ষের মতন ওর শান্তিতে বিশ্রাম নিতে ডাকছে।

বসন্ত

ও চকমকি মউবাসী ও গো!
ও গোচারণ হাসিভাসি ও গো!
ও আমুদিয়া কলরাশি ও গো!
—লোকগীতিকা।

ভোরের তন্দ্রা নাটঘাঁট করে বাচ্চাদের ঝালাপালা চিৎকার কানে আসছে। শেষ অবধি, ঘুমোয় কার সাধ্যি, নাচার হয়ে লাফ দিয়ে উঠে বসলুম বিছানাতে। খোলা জানলা দিয়ে বাইরের গ্রামদৃশ্য চোখে পড়ে, বুঝতে পারলুম এতখানি শব্দ করছে পাখিগুলো।

উঠে ঢুকলুম গিয়ে বাগানে, একটুখানি স্তব গাইলুম দিনের দেবতাকে নিবেদন করে। পাখিদের ঠোঁটে ঠোঁটে উপচে বের হয়ে আসছে মুক্ত ঐকতান গান—প্রাণদ, অন্তহীন। সোয়ালোর শিস্ ঢেউ দিয়ে উঠছে পুকুর থেকে, একটা খসা কমলার পরে বসে শিস্ দিয়ে চলেছে শামা পাখি, আর জ্বলন্ত আগুনের মতো ওরিয়োল— কিচিমিচি ডাক ডেকে চলেছে চিরসবুজ থেকে চিরসবুজে একটানা, নীলচে টুনিপাখি দীর্ঘ সূক্ষ্ম হাসির ধমকে ফেটে পড়ছে ইউক্যালিপ্টাসের চুড়োয় বসে, আর মস্ত পাইনগাছটার মধ্যে নির্লজ্জভাবে তর্ক করে চলেছে চড়াইগুলো।

কী ভালো সকালটা! সোনারুপোর আনন্দে সূর্য ভরে দিচ্ছে পৃথিবীকে, একশোরঙের প্রজাপতি খেলে বেড়াচ্ছে সর্বত্র— ফুলের ভেতরে-ভেতরে, বাড়ির আশেপাশে (ঢুকছে আর বের হয়ে আসছে ঘরে-দোরে), ফোয়ারার ওপর। সর্বত্র গ্রামাঞ্চল যেন বিস্ফোরণে ফেটে পড়ছে, ফুটছে, ক্বণ্ ক্বণ্ করে উঠছে সদ্য দৃপ্ত প্রাণোন্মাদনায়।

মনে হয় রয়েছি যেন মস্ত একটা আলোর মৌচাকের ভেতরে— সে হল বিশাল তাপোষ্ণ একটা জ্বলন্ত গোলাপের মাঝখানটা।

ঝর্নার ধারে ছেলেটা

ধুলোয় ধুলো অতখানি ঘাসডাঁটা-মুড়োনো উঠোনখামারের শুকনো তপ্ত মাটির ওপর দিয়ে যত আলতো হয়েই চলো চোখ অবধি শাদা ধুলোর গুঁড়োয় একেবারে আভরন হয়ে যেতে হয়, ছোটো ছেলেটা কেবল এমনিভাবে মিলে রয়েছে তিরতিরোনো ঝারাটুকুর সঙ্গে— মনে হয় ওরা দুয়ে হাসিতে-খুশিতে খোলামেলা একই ধারা। একটা গাছলতার চিহ্ন বলতে নেই, তবু গেলে মনে হয় একটা ছোট্ট শব্দ কানায় কানায় ভরে তুলছে বুকখানা, ঘননীল আকাশের পটে বড়ো বড়ো আলোর হরফে ফুটে উঠেছে সেই নামশব্দ : ওয়েসিস্। মরূদ্যান।

দুপুরমধ্যাহ্নের মতন তাপ সকালবেলাতেই, সান ফ্রান্সিস্কোর এই খামার-বাড়ির উঠোনে ঘুণপোকা ঝাঁ ঝাঁ করছে জলপাইয়ের গাছে। ছেলেটার ঠিক মাথার ওপর সূর্য, কিন্তু এমনি নিবিষ্ট ও জলের সঙ্গে যে টেরই পাচ্ছে না। কলকল জীয়ন্ত জলের ঝারার নীচে হাত পেতে আছে উপুড় হয়ে শুয়ে, আঁজলার ভেতর জলে দুলছে অপরূপ হিমপুরী এক, কালো দুটো চোখ যেন নিষ্পলকে বাঁধা হয়ে আছে তার সাথে। কথা বলছে নিজের সঙ্গে নিজে, নাক টানছে, ছালাকাটা জামার ওপর দিয়ে আরেকটা হাত দিয়ে চুলকোচ্ছে এখানসেখানে। তার সেই প্রাসাদপুরী, যত দেখ একইরকম, আবার ক্রমাগতই ঝলমল করে উঠছে নতুন হয়ে, এক-একবার দুলতে দুলতে ছায়াময় হয়ে যায়। ছেলেটা তখন তার সম্বিতে ফিরে আসে, টানটান হয়ে ওঠে ভেতরে-ভেতরে, নিজের মধ্যে এমনি ডুবে গেছে যেন তার আপন নাড়ির আঘাতস্পন্দন— যাতে চকিতে চকিতে ভেঙেচুরে যায় অমন স্পর্শময় স্থাপত্য, চোখপাশ দিয়ে যে রূপটুকু সে ধরে রেখে ছিল, সেও যেন জল থেকে না হরণ করে নিতে পারে।

জানি না প্লাতেরো, জানি না তুই আমার কথা বুঝতে পারিস কি না, তবু শোন বলি : ছেলেটা এই আমার প্রাণটুকু যেন মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছে।

খুব বুঝি আমরা দুজন দুজনাকে। যেখানে চায় যাক, ছেড়ে দি আমি ওকে ; আমায়ও ও নিয়ে যায় যেখানে চাই।

প্লাতেরো জানে লা করোনা-র সেই পাইনগাছটার কাছে পৌঁছে খুব ঘেঁষে দাঁড়াব, হাত ঘষব গুঁড়িতে, বিপুল জাফরি-ছাদের ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখব ; ও জানে ঘাসচেরা সরু মাড়া ধরে পুরোনো ফোয়ারার ধারে যেতে কত ভালো লাগে আমার ; পাইনপাহাড়ের চুড়োয় দাঁড়িয়ে নদী দেখতে কী ভীষণ আনন্দ, ভানুমতীর জাদু ছুঁইয়ে সেকেলে একখানা ছবি সেখানে খুলে যায় দেখি চোখের সামনে। পরম নির্ভর হয়ে ওর পিঠে বসে চলতে চলতে চোখ ঢুলে আসে ঘুমে, তবু ঠিক জানি চাইলেই দেখতে পাব মনে-মনে-চাওয়া এইরকমই কোথাও-না-কোথাও এসে গেছি।

নেহাৎ একটা ছোটো ছেলের মতন এই প্লাতেরো! যদি এবড়োখেবড়ো পথ হয়, যদি বুঝি একটু বেশি ভার হয়ে পড়েছি আমি ওর পক্ষে, তখুনি নেবে পড়ি পিঠ থেকে। চুমু খাই, খুনসুটি করি, উত্যক্ত করতে থাকি নির্দয়ভাবে। রাগ করে না ও একটুও, জানে ওকে ভালোবাসি। এতই ও আমারই মতন, এতই আলাদা অন্য সবার চেয়ে যে মনে হয় ওও আমারই সব স্বপ্ন দেখে বুঝি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে।

আবেগ ভর্তি একটা কিশোর ছেলের মতন প্লাতেরো ঘুরতে থাকে আমার পায়ে পায়ে, কিছুতে ওর না নেই। মনে হয় আমিই বুঝতে পারি ওর অসুখ। অন্য লোকজন, বলব কি, অন্য গাধা দেখলেও ও এড়িয়ে চলে সন্তর্পণে।

ঘুমপাড়ানি

কয়লাওলার ছোট্ট মেয়েটা— ফুটফুটে, নোংরা, একটা চাঁদির টাকার মতন, চকচক্‌ করছে কালো চোখদুটো, লেপটা কয়লার গুঁড়োর মধ্যে দিয়ে আয়ত ঠোঁটদুটোতে যেন রক্ত ফুটে পড়ছে, ঝুপড়ির দোরগোড়ায় একখানা ইট পেতে বসে ঘুম পাড়াচ্ছে খুদে ভাইটাকে।

ঝম্‌ঝম্‌ করে কাঁপছে বৈশাখের দিন, সূর্যদেবতার হৃৎকেন্দ্রের মতো অরুণরঙিন, জ্বলছে। শান্তি, উজ্জ্বল শান্তি— মাঠের মধ্যে খোলা উনুনের পরে রান্না ফুটছে হাঁড়িতে, সেই আওয়াজের সঙ্গে গোচারণ থেকে ভেসে এল— হা ম্বা— শ্লথ ডাক, ঝাড়বাঁধা ইউক্যালিপ্টাসের ডালপালা গলে খুশিতে হুটোপুটি করছে সমুদ্রবাতাস।

মনসুখে মিহি সুরে গান গাইছে সেই মেয়ে

‘আমার সো-না-আ ঘুমো-বেএ
রাখাল মেয়ের মন তুষিতে
আমার সো-না-আ ঘুমো-বেএ—’

সম্‌ একটুখানি। গাছের চুড়োয় চুড়োয় লাফাঝাঁপি করছে বাতাস···

‘ও রেএ আমার মানি-ক ঘুমো—
স্বপন দেখতে দেখতে ঘুমো—
ছোট্ট মায়ের একফোঁটা গান
শুনতে শুনতে ঘুমো-বেএ—’

বাতাস··· মন্থর পায়ে পায়ে প্লাতেরো ঘুরছে পোড়লাগা পাইনগাছগুনোর মাঝ দিয়ে, এগিয়ে এল আস্তে আস্তে··· শেষে শুয়ে পড়েছে মাটিতে গা ঢেলে, মিহি গলার একটানা ঘুমপাড়ানি শুনতে শুনতে ছোটো ছেলের মতন কখন ঘুমিয়ে পড়েছে অকাতরে।

পথপাশের ফুল

দেখ প্লাতেরো, রাস্তার পাশের ওই ফুলটা— কী নরম, কী সুন্দর, দেখ ! আলুথালু কলকল করতে করতে পাশ দিয়ে চলেছে দেখ গোরুছাগল, বে-রাশ ঘোড়া, লোকজনমানুষ, ও ঠিক অবিচল হয়ে রয়েছে— পলকা, চন্ননের রঙ, একতিল ময়লা লাগে নি গায়ে।

উঁচাইয়ের মুখটাতে এসে রোজ তো দেখিস— একটু সবজে বেদি দিয়ে বাঁধা। এখন দেখ, ওই ছোটো একটা পাখি এসেছে পাশে— আমরা যেতেই অমনি উড় দিয়েছে। কেন রে ? দেখ, গরমি মেঘ-গলা টলটলে জল ভর্তি যেন ছোট্ট বাটি একটা ; এই একটা মউমাছি ঢুকছে বসে, তো থাক তাই, একটুক্ষণ আঁকড়ে প্রজাপতি দুলতে লাগল মণিমুক্তোর গয়নার মতন, তো দুলুক তাই।

কদিন বাঁচবে রে ফুলটা, প্লাতেরো ? কিন্তু ওর এই স্মৃতি থাকবে চিরদিনকার। ওর জীবন হল তোর বসন্তদিনের একটা দিনের মতন, কিংবা বল আমারই এই বসন্তকালটুকুর মতন··· কী দিতে পারি না বল স্বর্গের এই ফুলটার বিনিময়ে আমাদের শরৎঋতুকে ?— যাতে ও আমাদের সবার সবার জীবনের সহজ অনিঃশেষ দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পায় দিনে দিনে ?

ইঁদারা

ইঁদারা !··· কী গভীর শব্দটা বল তো প্লাতেরো, কী রকম সবুজ, কালো, কী রকম ঠাণ্ডা, কী প্রতিধ্বনি বাজছে দেখ শব্দটাতে ! মনে হচ্ছে শব্দটা নিজেই যেন ঘুরতে ঘুরতে খুঁড়তে খুঁড়তে আঁধার মাটির নীচে নেমে গেছে যতক্ষণে হিম ঠাণ্ডা জলের গোড়াতে গিয়ে না পৌঁছয়।

দেখ : ডুমুরগাছটাতে একই সঙ্গে কেমন সেজে আছে ভেঙে যাচ্ছে ইঁদারার পাথরবেড়। ভেতরে, হাতের নাগালের মধ্যেই, ঝাঁঝালো নীল একটা ফুল ফুটেছে শেওলাধরা ইটের গায়ে। আরো নীচে, বাসা বেঁধেছে একটা গেরস্থ পাখি। তারও পরের তলায়, নিশ্চল ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে পান্নাপাথরের প্রাসাদ আর-এক সরোবর— একটা নুড়ি ছুঁড়ে ভাঙো জলের চুপটুকুনি, গুমরোতে থাকবে রাগে। সবার শেষে, আকাশ।

(রাত ঢুকল এসে ; রুপোর চাঁদ জ্বলছে গভীর তলাতে, চপল তারায় গা সাজানো। সব চুপ ! পথ-বরাবর অনেক দূরে উধাও হয়ে গেছে জীবন। চোখ-আড়াল হয়ে পালিয়ে চলেছে আত্মা ইঁদারার পাতালতলায়। গোধূলির আরেক পিঠ চোখে পড়ে তাকে পার হয়ে। যেন ইঁদারামুখ থেকে এখুনি উঠে আসবে নিশিরাত্রির সেই দৈত্য— দিক্-দুনিয়ার সমস্ত গুপ্তবিদ্যার যেন সে ভোজরাজা, আহা ইন্দ্রজাল ঘুরোনো শান্ত ধাঁধাপথ, আঁধার থমক লাগা তীব্রগন্ধী বাগিচা, ঘন টান ভরা আশ্চর্য আলোর নিকেতন !)

শোন প্লাতেরো, কোনোদিন দেখিস যদি ঝাঁপ দিয়ে পড়েছি ওই ইঁদারার ভেতর, জানিস সে মরবার অছিলাতে নয়, বিশ্বাস কর, সে শুধু আরো তাড়াতাড়ি করে তারার মঞ্জরী তুলে আনব বলে।

ব্যগ্র, তৃষ্ণার্ত, ডাক দিয়ে উঠল প্লাতেরো। ইঁদারার ভেতর থেকে নিঃশব্দ বিভ্রান্ত উঠে এল ত্রস্ত পাখি একটা।

উঠোনের গাছ

এই যে বাড়িটা এখন বন্ধ— ও আমার কবিতার প্রথম উৎস, ওই বাড়িতে যখন থাকতুম ওই একেশিয়া গাছটা পুঁতেছিলুম নিজের হাতে। বসন্তের পর বসন্তে ওর সবুজ আগুন বাড়তে লাগল, এখনো দেখ এই সূর্যাস্তের আলোয় অজস্র মমতাময় ডালপাতা দিয়ে আমাদের আচ্ছাদন করে আছে। এপ্রিল মাসে পান্নার মতো সবুজ, আর কাঁচা সোনার রঙ ধরেছে অক্টোবরে, ওর যে-কোনো একটা ডাল দেখা মাত্রেই কপালের তাপ আমার জুড়িয়ে যেত— যেন কিন্নরীর ঠাণ্ডা শাদা হাতের ছোঁয়াতে কোমল অপরূপ পরম শান্তির মতন।

আজ দেখ প্লাতেরো, গোটা উঠোনটা জুড়ে রানীর মতন ওই গাছটাকে! মোটাসোটা হয়েছে দেখ কেমন! জানি না এখনো আমাকে ওর মনে আছে কি না! আমার কাছেও ও আর সে-গাছটা নেই রে, ও আরেকজনা। এত দিন ধরে ওকে ভুলেছি যেন ওর আর অস্তিত্বই নেই, আমার সুখ, আমার বাসনার থেকে তফাৎ করে নিয়ে বছরের পর বছর ধরে বসন্ত ওকে গড়ে-পিটে নিয়েছে নিজের খেয়ালখুশিতে।

আমারই হাতে পোঁতা গাছ, তবু আজ আর ওর কোনো কথা নেই আমার সাথে। যে গাছই হোক, প্রথম ছুঁলেই বুকটা কেমন শিউরে দেয় দেখেছিস তো প্লাতেরো! আর এই যে গাছটা, এত যাকে ভালোবেসেছিলুম, এত যার মন জেনেছিলুম, ফিরে দেখা হতেও দেখছি আজ আর ওর আমায় কিচ্ছু বলবার নেই। মনখারাপ করে দেয়া সত্য, কিন্তু এর চেয়ে বেশি বলেই বা কী হবে! না রে, সূর্যাস্তে আর ডালেপাতায় জোড়-খাওয়া গিঁঠটার থেকে আমার সে বাজনাটা আর ঝুলতে দেখি না রে। শোভা করা শাখায় আর গান ফোটে না, পাতার চাঁদোয়ার ভেতরদিককার আলোকসজ্জাতে আর জেগে ওঠে না ভাববিশ্বটুকু।

আর এই যে এখানে আমি গন্ধে সুরে ভরা শীতল এতটুকু নির্জনতার স্বপ্ন নিয়ে 'জীবন থেকে পালিয়ে এসেছি, অসোয়াস্তি লাগছে এখানে আমার। ঠাণ্ডা লাগছে, এখানটা আমি এখন ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচি যেমন তখন ক্লাব-থিয়েটার-ম্যরখানা ছেড়ে এখানে চলে আসতে পারলে বেঁচে যেতুম রে প্লাতেরো।

লাথি

আমরা যাচ্ছি মন্‌তেমায়োরের খামারবাড়ি, গো-দাগানো পটিতে। বাঁধানো উঠোন, অপরাহ্নআকাশের বিশাল নীলিমার নীচে ছায়া-হিম হয়ে আছে, ঝন্‌ঝন্‌ করে স্পন্দিত হয়ে উঠছে তাজি ঘোড়ার হ্রেষায়, মেয়েদের ঝকঝকে কাকলী-হাসিতে, তীক্ষ্ণ অশান্ত কুকুর-ডাকে মিলে। এককোণায় প্লাতেরো অধৈর্য হয়ে উঠছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

'কিন্তু দাদা, তুই যে বড্ড ছোটো ; তুই তো যেতে পারবি না আমাদের সাথে', আমি গিয়ে তাকে বলি।

এমনি সে খেপে উঠল ছটফটিয়ে যে তোন্‌তোকে বললুম, 'ওর পিঠে চাপ তা হলে, নিয়ে চল ওকে আমাদের সঙ্গে।'

ঝলমল গ্রামের পথ ধরে ঘোড়া চেপে চলা— সে যে কী আনন্দ! জলা হাসছে, তার চার পাড় ঘোরানো যেন সোনার বেড়, তার ভাঙা আয়নায় রোদ পড়ে যেন শতগুণ অসংখ্য হয়ে পড়ছে হাওয়াকলগুলো। ঘোড়ার খুরের শক্ত গোল শব্দের ভেতরে প্লাতেরোর হালকা দড়বড়ি শোনা যায় যেন দ্রুত হয়ে উঠছে সময়ের তালে তালে, পাছে সে একা হয়ে পড়ে রাস্তায়। হঠাৎ বন্দুকের গুলি ছোটার মতো একটা আওয়াজ। প্লাতেরো আলতো একটুখানি মুখঘষা দিয়েছিল চিকচিকে একটা মদ্দা ঘোড়ার পেছন-দাবনাতে, সেও তুরিৎ জবাব দিয়েছে দ্রুত চাট্‌ হাঁকড়ে। কারও লক্ষ্য হয় নি, কিন্তু আমি ফিরে দেখি রক্ত ঝুঁঝিয়ে পড়ছে প্লাতেরোর আগুপায়ে। ঘোড়া থেকে নাবলুম, নেবে একগাছি ঘোড়ার কেশর আর একটা কাঁটা পেঁচ দিয়ে বেঁধে দিলুম গিয়ে ছেঁড়া শিরাটুকু। তারপর তোন্‌তোকে বললুম, 'যা, ওকে নিয়ে ঘরে ফিরে যা।'

মন্থর, বিষণ্ণ, দুটিতে পিছু ফিরল— শুকনো সোঁতার খাত ধরে যে পথটা শহরে গেছে সেই রাস্তাতে, মাথা ঘুরিয়ে প্রত্যাশায় ফিরে ফিরে দেখে আমাদের বিদ্যুদ্দীপ্তির মতো অপস্রিয়মান ঘোড়সোয়ারদলটাকে।

খামারবাড়ি থেকে ফিরে যখন দেখতে গেলুম প্লাতেরোকে, দেখি সে মুষড়ে মনমরা হয়ে আছে।

ফিসফিস করে বলি, 'বড়ো, বয়স্ক লোকেদের সঙ্গে কোথাও তোর যাওয়া চলে না, দেখলি তো?'

গাধামি

এক অভিধানে পড়লুম : গা ধা মি : বি. গাধার ক্রিয়াকার্যের বর্ণনার্থে ব্যবহার, ব্যঙ্গচ্ছলে।

বেচারা গাধা! এমন ভালো, শাদাশুধো বুঝমান জীবটি! ব্যঙ্গচ্ছলে··· কেন? এর চাইতে গুরুতর বর্ণনার যোগ্য নয়, যার ঠিক-ঠিক বর্ণনা হয় আসলে বসন্তদিনের একটা গল্পের মতো? কেন, যে লোকটা দয়াবান্ তাকে কেন বলব না গাধার মতো! আর বজ্জাত গাধা, তাকে বা ডাকব না কেন মানুষ নাম দিয়ে! ব্যঙ্গচ্ছলে··· তোর মতন অমন যার জ্ঞানবুদ্ধি, বুড়ো আর ছেলেদের, নদী আর প্রজাপতির, সূর্যের, কুকুরদের, ফুল আর চাঁদের অমন যে বন্ধু; ধীরস্থির, ভাবুক, বিষণ্ণ, সবার জন্যে ভালোবাসায় ভরপুর। মার্কস অরেলিয়স ওই খোলা মাঠখানার।

সন্দেহ নেই কথা বোঝে প্লাতেরো, চেয়ে দেখছে আমায় কোমল কাঠিন্যে ভরা উজ্জ্বল দুটো বড়ো বড়ো চোখ মেলে, যার ভেতরে সূর্য জ্বলছে ছোট্ট হয়ে, ঝলমল করছে কালচে-সবুজ এতটুকখানি উত্তল আকাশের মধ্যে। যদি ওর ওই চুলে ভর্তি অতখানি মাঠোয়ালি মাথাটাতে ও ধারণা করতে পারত আমি ন্যায়বিচার করছি ওর ওপরে! যদি জানতে পেত অভিধান যারা লেখে তাদের চাইতে ঢের ভালো আমি বুঝি, আর, আমিও প্রায় ওরই মতন ভালো!

বইখানার মার্জিনে আমি ফিরে লিখে রেখেছি : গা ধা মি : বি. অভিধান যারা লেখে সেই সব নির্বোধ লোকেদের বর্ণনার্থে ব্যবহার, ব্যঙ্গচ্ছলে।

মেয়েটা আর আমরা

প্লাতেরো মনে আছে, সেই মেয়েটা রে— বোধ হয় দূর দেশে যাচ্ছিল! কোথায় বলতে পারিস? আমাদের ওপরে ওই উঁচু দিয়ে কালো রোদেপোড়া রেলগাড়ি ঝমঝম করে চলে গেল উত্তরমুখো, মনে হল বড়ো বড়ো শাদা মেঘের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটেছে।

তোর সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলুম আমি নীচে, লাল হলিহকের রক্ত-ছিটোনো হলদে ঢেউ-তোলা গমের মাঠে আমরা দুজন, এরই মধ্যে ছাইয়ের একটা সরু হার যার চুড়োয় পেঁচিয়ে দিয়ে গেছে জুলাই মাস। আর সেই নীল ধোঁয়ার আঁশ-ছেঁড়া হালকা মেঘ— মনে পড়ছে? বৃথাই পাক খেতে খেতে চলেছে শূন্যতার দিকে— রোদ আর সে ফুলগুনোকে এক মুহূর্তের মনে কী রকম বিষণ্ণ করে তুলল?

কালো ঘোমটা দেওয়া ক্ষণিক ফরসা মুখ··· যেন তুরিত পালানো রেলগাড়ির জানলার ফ্রেমে বাঁধা শরীরিণী মায়া···

বুঝি সে মেয়েও ভাবছিল: 'কালো মুখ করে দাঁড়িয়ে ওই লোকটা বা কে? আর ওই রুপোলি ছোট্ট গাধাটা··· ওরা কারা?'

বল তো কে হতে পারে?

তুই, আর আমি··· না রে প্লাতেরো?

ঝিঁঝিঁর গান

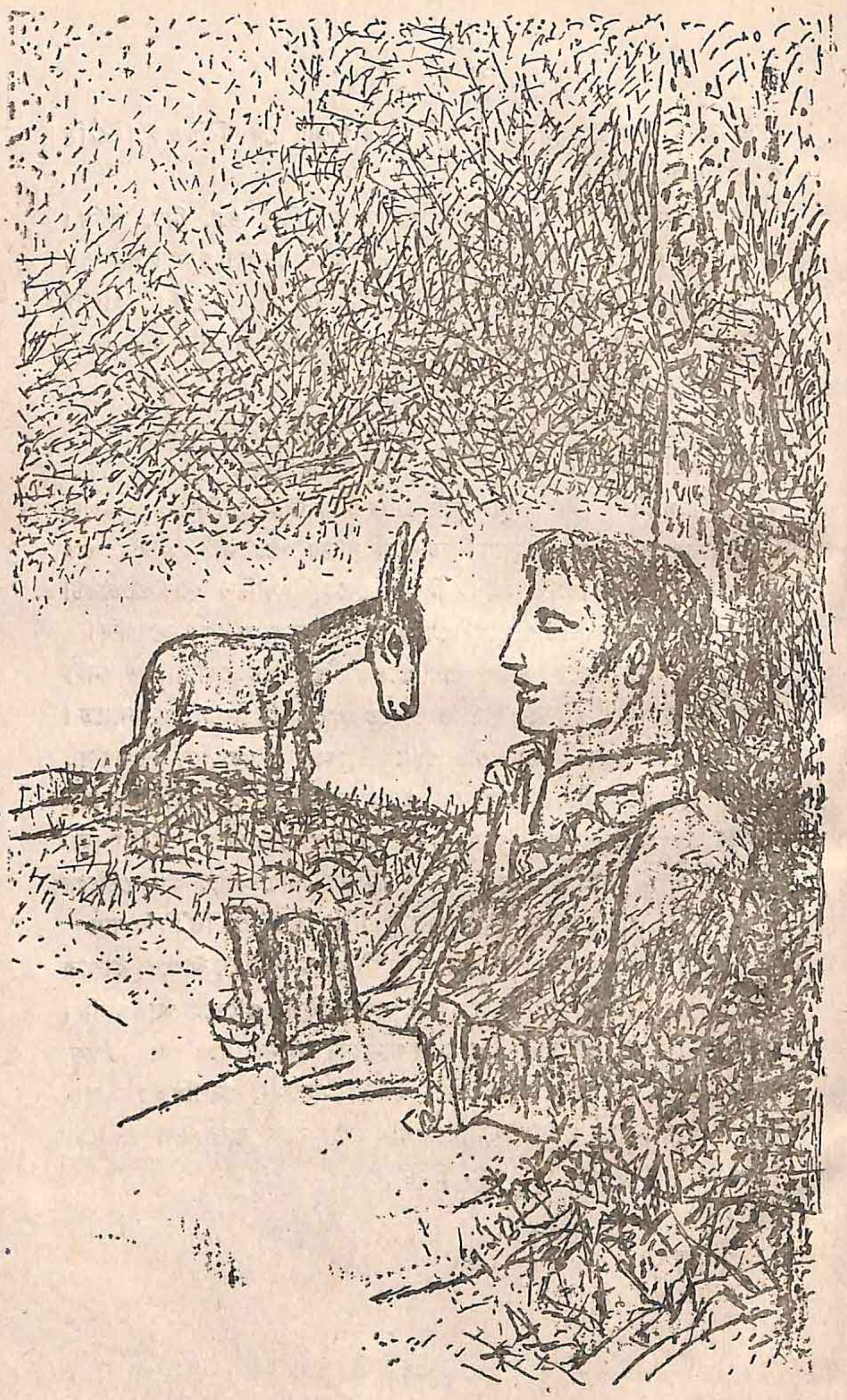
রাতে রাতে ঘুরে বেড়ানোর ফলে ঝিঁঝিঁর গানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছি প্লাতেরো আর আমি।

সন্ধ্যের সময়কার ঝিঁঝিঁর পয়লা যে গান সে হল দ্বিধা ভরা, নিচু, কর্কশ। স্বর পালটাতে থাকে, নিজের কাছেই একটু শিখে-প'ড়ে গলা চড়াতে থাকে সে ক্রমশ— যেন সে একতান হয়ে উঠতে চাইছে স্থান আর কালের সঙ্গে। তারপর হঠাৎ, সজল, সবুজ আকাশে যখন তারা ফুটে পড়েছে, সে গান তখন একটা রুপোর ঘণ্টার মধুস্বর হয়ে উঠল।

ঠাণ্ডা বাতাস আসে যায়; রাতের ফুল পাপড়ি মেলে ওঠে; সমতল প্রান্তর ছেয়ে নীল মাঠের দিব্য পবিত্র একটা নির্যাস ভেসে বেড়ায় একাধারে স্বর্গীয় আর পার্থিব। উল্লাসে ফুলে ফুলে উঠতে থাকে তখন ঝিঁঝিঁর গান, ছায়ার নিস্বনের মতো কানায় কানায় ভরে দিতে থাকে মাঠের পরে মাঠ। আর তার দ্বিধা নেই, আর তার বিরতি নেই। নিজের থেকে উৎসারিত হয়ে প্রত্যেকটা তার স্বর যেন যমজ অপরটার, দুয়ে মিলে তারা যেন কালো ফটিকের যুগলবন্দি।

প্রহর কাটতে থাকে অপার প্রশান্তিতে। পৃথিবীতে কোনো যুদ্ধ নেই, মজুররা ঘুমিয়ে আছে তৃপ্ত হয়ে, আকাশ দেখতে পাচ্ছে নিদ্রার গভীর তলাতে। বাগানের বেড়া-বাওয়া আঙুরলতার ঝোপে লুকোনো হয়তো সে ভালোবাসা, চোখে চোখে চেয়ে জানে কাকে বলে প্রমত্ত আহ্লাদ। এই সব মাঠ কোমল সুগন্ধের বার্তা পাঠায় শহরে— অগোপন অনাবৃত কৈশোরের রূপে। গমশীষ ঢেউ দিয়ে ওঠে চাঁদনি আলোয় সবুজ হয়ে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে থাকে প্রথম ভোরের বাতাসে।··· তার অবারিত বহতার ফলেই হারিয়ে গেছে সে ঝিঁঝিঁর গান···

এই সে গান। ওগো প্রথম ভোরের ঝিঁঝিঁর গান— হিমে কাঁপতে কাঁপতে শিশিরে শাদা হয়ে যাওয়া পথ ধরে যখন ঘরমুখো ফিরছি প্লাতেরো আর আমি। ঘুমআতুর লাল চাঁদ ঝরে যায়। এখন সে গান যেন চাঁদনির ঘোর খেয়ে টলছে, তারায় তারায় উন্মাতাল, ফিরে ফিরে মেদুর, রহস্যময়, ঘনপুঞ্জিত। আর ঠিক তারই পর, বিষণ্ণ, নীলচে গিরিরঙের পাড় দেয়া বড়ো বড়ো শোকার্ত মেঘ আস্তে আস্তে সাগর থেকে তুলে আনে দিনটাকে···



এই কাছে এই দূরে উৎসবরঙানো সকালবেলার আকাশ ভরে ঠিকরে পড়ছে ঘণ্টার উঁচু আরাব, যেন আগাগোড়া ফটিক দিয়ে গড়া ওই আদিগন্ত নীলিমা। অবারিত মাঠ, যেন রোগা লাগছে একটু এখন, মনে হচ্ছে সহর্ষ ঘণ্টার বিন্দু বিন্দু ধ্বনি সোনা হয়ে জমে উঠেছে তার সর্বাঙ্গে।

সবাই, গাঁয়ের পাহারাদারটা অবধি মেলা দেখতে গেছে শহরে। শুধু আছি একলা এই আমি, আর ওই প্লাতেরো। কী শান্তি! কী মুক্তি! কী সুখ! প্লাতেরোকে ছেড়ে দিলুম উঁচাই মাঠে, তারপর পাখি-ভর্তি একটা পাইনগাছের তলা বেছে ঠেস দিয়ে খুলে বসেছি ওমর খৈয়াম···

ঘণ্টার দুটো ঘায়ের মাঝখানে যে স্তব্ধতা তারই মধ্যে শব্দে রূপে ফুটে উঠছে সেপ্টেম্বর-সকালের গূঢ় অন্তরাবেগ। · আসবরসে টসটসে গুচ্ছ গুচ্ছ মনাক্কাআঙুরের থোপা বেড় দিয়ে ঘুরে ঘুরে উড়ছে সোনালি-হামির ভোমরা; আর ফুলের থেকে তফাৎ করা যায় না যে প্রজাপতিদের— দেখি ক্রমাগত রঙবদলের খেলায় মেতেছে উড়তে উড়তে। আলোর বিশাল একখানা ভাবনার মতন এই নির্জনতা।

ঘাস খেতে খেতে প্লাতেরো হঠাৎ হঠাৎ থেমে আমার দিকে তাকায়। থেকে থেকে বই থেকে চোখ তুলে আমিও চেয়ে থাকি প্লাতেরোর দিকে।

তোর সঙ্গে বাজি প্লাতেরো, ওই সব ছেলেমেয়েরা ওরা কী চাইছিল তুই জানিস না। ওরা এসেছিল তোকে নিয়ে যেতে দি কি না, আজ বিকেলের ষাঁড়লড়াইয়ে যাবার চাবিকাঠিটা পায় কি না, দেখতে। ভাবিস নে। বলে দিয়েছি, এমন কথা ওরা যেন মনেও না আনে।

উত্তেজনায় সব খেপে আছে রে প্লাতেরো। গোটা শহরটা ছটফট করছে ষাঁড়লড়াইয়ে যাবার জন্যে। ভোর হওয়া থেকে জমাতে-সরাইয়ে গান বাজতে শুরু করেছে ; এখন তার সুর কেটে গেছে ; গাড়ি আর ঘোড়া ছুটেছে ন্যুয়েভা স্ট্রিটের দিকে, ন্যুয়েভা স্ট্রিটের থেকে। আসল জায়গায়, সেখানে এখন 'ক্যানারি' সাজাচ্ছে— ষাঁড়লড়িয়েদের সাজ করিয়ে দেখাবার সেই হলদে গাড়ি— ছেলেপুলেদের যা দেখবার এত লোভ! ফুল মুড়িয়ে নিয়ে গেছে যত বাগান থেকে, তাদের উৎসাহিকা মেয়েদের জন্যে। ভারি দুঃখের রাতটা, অল্পবইসী ছেলেরা চক্কর দিয়ে ফিরছে রাস্তায় রাস্তায়, তাদের চওড়া-কানা টুপি হেলে বেঁকে পড়েছে, তাদের সিগার, তাদের জামা, তারা নিজেরা— সব-তাতে ঘোড়ার আর ব্র্যাণ্ডির গন্ধ উঠছে।

বেলা দুটো নাগাদ, রোদালো নির্জনতার সেই সময়টাতে, দিনের সেই শূন্য মুহূর্তে যখন সাজ করতে বসেছে ষাঁড়লড়িয়ে আর তাদের সে উৎসাহিকা মেয়েরা, তুই আর আমি পাশদুয়োর দিয়ে বেরিয়ে পড়ব, গলি-শুঁড়ি ধরে চলব গাঁয়ের দিকে যেমন আর-বছরে গিয়েছিলুম।

কী সুন্দর লাগে গাঁ-খানা, এই সব ছুটির দিনে যে দিনে সবাই বেরিয়ে গেছে গাঁ ছেড়ে? আঙুরবাগ, আরো যত বাগান, সব খাঁ খাঁ করছে, এমন কি একটা বুড়ো লোককে অবধি কদাচিৎ দেখা যায়— একটা টোকো আঙুরের ঝাড়ে দেহ বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে, কিংবা টলটলে একটা পুকুরের পাড়ে ঝুঁকে বসে আছে। দূরে, শহরের দিক থেকে বয়ে আসে উত্তাল চিৎকার, হাততালি, আর ষাঁড়লড়াইয়ের তালে তলে সমস্বর বাজনার সুর— পায়ে পায়ে সমুদ্রের দিকে যেতে যেতে আস্তে আস্তে সে হারিয়ে যায়। আর প্রকৃতির ওই শরীরটার একচ্ছত্র প্রভু বলে অনুভব হতে থাকে রে প্লাতেরো আত্মাকে, যদি মানো তাকে, যে পারে সে দেখতে পারে তার ভাস্বর শাশ্বত রূপটুকু।

নকটার্ন

লাল আলোয় সাজানো উৎসবের শহর থেকে তীক্ষ্ণ মনখারাপি নিক্কণ নরমি হাওয়া ভর করে ভেসে যাচ্ছে আকাশে। অস্থির, বেগনি বিস্মৃতি— নীলবিবর্ণ সেই মণ্ডলের মধ্যে মিনারটা দেখাচ্ছে আগাগোড়া ছাইমাড়া, বোবা, কঠিন। আরো দূরে, শহরতলির শুঁড়ির চালাগুনোর পেছনে নিচু হলুদরঙের চাঁদ নিঃসঙ্গের ক্লান্তিতে ঘুমচোখে ডুবতে বসেছে নদীর জলে।

গাছপালা আর তার ছায়া নিয়ে একলা পড়ে আছে গ্রাম। ঝিঁঝিঁর ভাঙা গান, লুকোনো জলের ঘুমভারা কথা আর ভিজে একটা কোমলতা— যেন ওই আকাশ-ভর্তি তারা গলে পড়ছে একটু একটু করে··· আস্তাবলের ওমের ভেতর থেকে প্লাতেরো ডেকে উঠল বিষাদজড়ানো গলায়।

ছাগলটাও জেগে আছে নিশ্চয় ; ঘুন্‌টি শুনছি— প্রথমে ঝাঁকানো আওয়াজ, তারপর আস্তে আস্তে। নীরব হয়ে এল অবশেষে··· দূরে, মন্‌তেমায়োরের দিকে আরেকটা গাধা ডেকে উঠল··· ওদিকে ভাল্যেহয়েলোর দিক দিয়ে আরেকটা··· কুকুর ডাকছে একটা···

এত উজ্জ্বল রাত যে বাগানের ফুলগুনোর রঙ অবধি যেন দিনের মতন স্পষ্ট দেখা যায়। ফুয়েন্তে স্ট্রিটের শেষ বাড়িটার কাছে দপ্‌দপ্‌ করা একটা লাল আলোর নীচ দিয়ে একলা একটা লোক মোড় ঘুরল··· আমি? না তো। আমি— সুগন্ধ, চঞ্চল, সোনালি-নীল আবছায়া জ্যোৎস্নায় ভাঙাচোরা ছায়া, শান্ত বাতাস আর লাইলাকফুলের ভেতর গূঢ় নিঃসঙ্গ হৃদয়ের ফিসফিস কথা শুনছি যে আমি কান পেতে।

আর্দ্র, অনুগত, পৃথিবী ঘুরে চলেছে···

তারার ফুলকি জলা দু বালতি ইঁদারার জল খেয়ে প্লাতেরো ফিরছে আস্তাবলে, মন ভুলে, ধীর পায়ে পায়ে, সূর্যমুখীর লম্বা লম্বা ডাঁটার মাঝ দিয়ে। সূর্যমুখীর তপ্ত সুবাস জড়িয়ে চুন-করা উঠোনে ঠেস দিয়ে শুয়ে আছি ওর অপেক্ষাতে।

নিচু চালের ওপারে ঘুমিয়ে আছে ভিজে হিম কার্তিকের সুদূরান্ত মাঠ, পাইনের খরগন্ধ উঠছে তার সারা গা দিয়ে। পৃথুলা মুরগির মতন মস্ত কালো একখণ্ড মেঘ বিইয়ে গেল সোনার ডিম, পাহাড়ের চুড়োয় পড়ে আছে সেই চাঁদ।

চাঁদকে বললুম :

…মা সোলা
হা কেস্‌তা লুনা ইন থিয়েল্‌, চে দা নেস্থনো
কাদের ফু ভিস্‌তা মাই সে নোন ইন সোগ্‌নো।

প্লাতেরো নিষ্পলকে তাকাল চাঁদের দিকে। পরুষ অথচ লঘু একটা আওয়াজ করে ঝাঁকাল একটা কান। আমার দিকে ফিরে চাইল তারপর পূর্ণ বিস্ময়ে, ঝাঁকি দিল আর-কানটায়।

চাঁদের কলার মতন সুন্দর ধবধবে কুকুর ওই ডায়না, বুড়ি ধোঁয়াশলা ছাগলটা, আর ওই বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো— এরা হল প্লাতেরোর খেলার সাথী।

ছিপছিপে সপ্রতিভ ডায়না গলার ঘুন্‌টি বাজাতে বাজাতে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নাক কামড়ে দেয়ার ভান করতে থাকে গাধাটার মুখের ওপর। ক্যাকটাস-কিরীচের মতন কানদুটো উঁচিয়ে মৃদু ঢুঁসো দেয় প্লাতেরো আর ফুলফোটা ঘাসের জাজিমের পরে উলটিপালটি খেতে থাকে কুকুরটা।

আর সেই ছাগল-বুড়ি প্লাতেরোর পাশে এগিয়ে গিয়ে গা ঘষতে থাকে তার পায়ে পায়ে, পিঠে-চাপানো ওর খড়-বোঝার খড় টানতে থাকে দাঁতে কামড়ে, গাঁদা কি একটা নয়নতারার ফুল মুখে নাড়তে নাড়তে দাঁড়ায় মুখোমুখি হয়ে, লাফিয়ে উঠে ঢুঁ দেয় মাথার চাঁদিতে, আবার তখুনি পিঠটান দিয়ে পিছিয়ে এসে ডাকতে থাকে নরম গলায়, খেলুড়ী মেয়েদের মতন।

বাচ্চাদের কাছে প্লাতেরো যেন একটা খেলনা, হাজারটা দুষ্টুমি-নষ্টামি ওদের মুখ বুজে সইতে ওর একটু অধৈর্য নেই! কী শান্ত চলবার ছাঁদটুকু! থেমে দাঁড়িয়ে, বোকা সেজে ঘুরছে, খেয়াল আছে কেউ আবার না পড়ে পিঠ থেকে! আবার হঠাৎ করে লাফ দিয়ে দড়বড় করে মহা ভয় দেখিয়ে উঠছে একএকবার!

মোগেরের শরৎবিকেলবেলা! স্বচ্ছ শব্দপুঞ্জকে তীক্ষ্ণ করে তুলছে অনঘ অক্টোবর বাতাস, পাহাড়দরীর মাঝখান দিয়ে বলকে বলকে উঠে আসছে হী হী হা হা ম্যা হ্যা ব্যা অ্যা ভৌ ভৌ— ছেলেপুলেদের হাসিকলরোল, ঘণ্টার ঠুন্‌ঠুন্ ছাগল-ডাক, কুকুর-ডাক আর গাধার উচ্ছ্বাসে মিশোল ছন্দিত সুখতরঙ্গ।

বুনো হাঁস

জল দিতে এসেছিলুম প্লাতেরোকে। খামারবাড়ির স্তব্ধ নিঃশব্দের মধ্যে হঠাৎ শুনি অনেক ওপর দিয়ে শান্ত রাতের শাদা তুলোর মেঘ আর রুপোর কুচি তারার মাঝ ফুঁড়ে একের পর এক অনিঃশেষে তুরিত ডানায় উড়ে চলেছে তীক্ষ্ণ শিস্-ডাক।

বুনো হাঁস। সমুদ্রঝড়ের হাত থেকে পালাচ্ছে ভেতরের দেশে। থেকে থেকে, আমরা উঠে গেছি না ওরাই নেমে এসেছে কে জানে— ডানার খসখস, ঠোঁটের ক্ষীণ ঘষটানির আওয়াজটুকু যেন শুনছি স্পষ্ট।

এখন ওই অন্তহীন উড়াল-বাঁধা শিস্-ডাক চলবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

থেকে থেকেই প্লাতেরো জল খাওয়া বন্ধ করে মাথা তুলে চাইছে ওপরমুখো, ঠিক যেন মিলেতের আঁকা সেই মেয়েটা, আমিও তেমনি সীমাহীন শান্ত হাহাকার বয়ে তারার পুঞ্জের দিকে চেয়ে।

ছোটো মেয়েটা

ছোটো মেয়েটাকে দেখতে পেলে প্লাতেরোর ভারি আনন্দ। যেই দেখে লাইলাক ঝোপের মাঝ দিয়ে— ধবধবে শাদা পোশাক, খোড়ো টুপি মাথায়— 'প্লাতে— রো, প্লাতেরি— ল্লো—' বলে নরম আদুরে গলায় ডাকতে ডাকতে আসছে, বোকা গাধাটা একটা দামাল ছেলের মতন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে দড়িটড়ি ছিঁড়ে ফেলতে যায়, চেঁচাতে থাকে পাগলের মতো।

মেয়েটা ওর পেটের তলা দিয়ে একবার এধার একবার ওধার করতে থাকে পরম নিশ্চিন্তে। পা দিয়ে বাড়ি দিতে থাকে আস্তে আস্তে, বড়ো বড়ো হলদে দাঁত সাজানো মস্ত গোলাপি মুখখানার মধ্যে লিলিফুলের মতন ওর হাত দিল ঢুকিয়ে, হাতের বরাবর নুইয়ে-দেয়া কানটা ধরে যতরকম জানে আদর-ডাক ডাকতে থাকে— 'প্লাতে— রো ! প্লাতে— রো-ন্ ! প্লাতেরি— ল্লো ! প্লাতেরু— চো— '

দিন বড়ো হয়ে গেছে। রেলিঙ-ঘেরা খাটের বিছানায় ছোটো মেয়েটা তরতর করে পাড়ি দিয়ে চলেছিল নদীর ভাঁটি টানে টানে যমপুরীর কাছাকাছি, প্লাতেরোর কথা কারোর মনে পড়ে নি। ও-ই শুধু ভুল বকতে বকতে কাতরে ডেকে উঠল 'প্লাতেরি— ল্লো !' ছায়াশ্বাস ভরা আঁধার ঘর থেকে ভেসে এল আর্তমন্থর ওর বন্ধুর দূরাগত সাড়া। হায় রে শোকতাপ করা গ্রীষ্মের দিন !

কী আলো সে দিনে— কবর দেয়ার সেই বিকেলবেলাটাতে। ঠিক আজকের মতন এমনি গোলাপে-সোনায় মোড়া দিন, আশ্বিন শেষ হয়ে আসছে। পূর্ণ ফোটা অস্তমণ্ডলের ভেতর কবরখানার ঘণ্টার রণন একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে দ্যুলোকের দিকে ! একলা অবসন্ন মাথা নুয়ে ফিরছি আমি চত্বরের পাঁচিলের নীচ দিয়ে, বাগানের পাছদুয়োর দিয়ে বাড়ি ঢুকলুম। গোটা মানুষজাতের থেকে পালিয়ে সোজা ঢুকেছি গিয়ে আস্তাবলে, প্লাতেরোর সঙ্গে একসাথে বসে কাঁদব।

রাখাল

দিনশেষের বেগনিরঙা প্রহরটুকু ক্রমে আঁধার ছমছম হয়ে উঠল টিলার ওপর, অস্ত-আকাশের সবুজ স্ফটিকের পটে শিল্যুট-ছায়ার মতন; সন্ধ্যেতারার নীচে বাঁশি বাজাচ্ছে বসে রাখাল ছেলে। ফুল আর ফুলের জাল-পাশ সর্ব অঙ্গে, অন্ধকারে হারিয়ে গিয়ে আরো ঘনগন্ধে প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছে যত ফুল— যেন সুবাসরভসে রূপবন্ত হয়ে উঠেছে সব অন্ধকারের ভেতর— শহরপাড়ায় ঢোকার মুখে, চেনা পথ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ভেড়ার গলায় হালকা রিন্‌রিন্ ঘুন্‌টি বাজছে শ্লথ হয়ে।

'ও বাবু, গাধাটা আমায় দিয়ে দেও না গো বাবু…'

হা-ঘরে ছেলে, আধবোজা মলিন প্রহরের ভেতর আরো মিশছায়া স্বপ্নময় চঞ্চল দু চোখ ভরে জড়ো করেছে যেটুকু আলো তখনো লেগে ওই দিনান্তের গায়ে, সেভিল্যার শিল্পী বার্তোলোমি এসতেবানের আঁকা ভিখিরি ছেলেদের যে সব ছবি দেখেছি যেন তাদেরই কারোর মতো।

দিয়ে দিতে পারি গাধাটাকে… কিন্তু প্লাতেরো, তোকে ছেড়ে কী করে থাকব, প্লাতেরিল্লো!

মন্‌তেমায়োরের আশ্রমবাড়ির মাথার ওপর গোল হয়ে উঠে এল চাঁদ, ছিট্ ছিট্ শেষ আভা লাগা মাঠের ওপর একটু একটু করে চলকে ছড়িয়ে যাচ্ছে; ফুলের নক্‌শা তোলা মাঠটা লাগছে যেন স্বপ্নের মাঠ— আদিম, অপরূপ, আশ্চর্য ফিতে বাঁধা; অনেক বড়ো বড়ো লাগছে পাথরচাঙড়াগুলো— সঙ্কুল, বিষাদগ্রস্ত; অলখ ফোয়ারার জল কাঁদছে ক্ষান্তিহারা নিনাদ করে…

অনেকটা দূর পিছু হয়ে গেছে রাখাল ছেলে, ওইখান থেকে চেঁচাচ্ছে লোভী গলায়:

'ও বাবু, গাধাটা আমায় দিয়ে দেও না গো বাবু…'

টিলা

টিলার চূড়োয় শুয়ে আছি, একই সাথে রোম্যান্টিক আর ধ্রুপদী— এমনিভাবে আমার দেখেছিস কখনো প্লাতেরো ?

গোরুবলদ চলে যাচ্ছে, ছুটকো কুকুর, কাকপক্ষী ; নড়ি না, চোখ চেয়েও দেখি না। রাত হয়ে এল, যতক্ষণ না অন্ধকার আমায় মিলিয়ে নেয় আমি উঠি না। মনে নেই কবে প্রথম নিজেকে দেখতে পেয়েছিলুম এখানে, কোনোদিন ছিল কি এমন যখন যেতুম না? কে জানে। তুই জানিস কোন্ টিলার কথা বলছি: পুরোনো সেই কোবানো আঙুরবাগিচার ওপরে কবন্ধের মতন দাঁড়িয়ে সেই যে সেই শুরকিরঙের টিলা।

ওই চূড়োতে বসেই পড়েছি যা কিছু পড়েছি, ওই চূড়োতে বসেই তো ভেবেছি যা কিছু ভেবেছি। সমস্ত জাদুঘরে দেখে আসছি আমার আঁকা আমার সেই ছবি : কালো বেশ পরা, শুয়ে আছি বালির ওপরে, নিজের পানে ফিরে, তার মানে তোর দিকেই মুখ করে, নয় তো যে আমায় দেখছে তারই দিকে চেয়ে— অবাধে ঘুরছে আমার ভাবনা— এই দু চোখ আর ওই অস্তসূর্যের মাঝ-বরাবর।

খেতে যাবার শুতে যাবার ডাক আসে, কেউ ডাকতে আসে লা পিনিয়ার বাড়ি থেকে। যাই নিশ্চয়, তবু কিছুতে ঠিক করতে পারি না টিলার চূড়োতেই রয়ে গেছি কি না। আর ঠিক জানি এখানে আমি তোর সঙ্গে নেই রে প্লাতেরো, সত্যি সত্যি কোথাও আমি নেই যেখানে আমার থাকবার, এমন কি গোরের ভেতরেও নেই মরার পরে ; আছি কেবল একই সাথে ধ্রুপদী আর রোম্যান্টিক ওই শুরকি-টিলাটাতে আছি বসে, বই হাতে, নদীতে ঢলে পড়ছে অস্তসূর্য, দেখছি।

শেষবিকেলের আকাশটা কী সুন্দর দেখ প্লাতেরো, ওর ধাতব শারদ আলো যেন পালিশ সোনার একখানা চওড়া কিরীচ। এই পথটায় আসতে এত ভালো লাগে, জনমানুষহীন ওই টিলার ওপর থেকে এত ভালো দেখায় ওই সূর্যাস্ত··· কেউ নেই কাছেপিঠে, আমরাও উপদ্রব নই কারোর।

কতকগুলো মালগুদামের মাঝখানে নীলে-শাদায় রঙ করা একটা মাত্র বাড়ি, নোংরা দেয়ালে পাড়ের মতন বাইছে বুনো কাঁটালতার ঝাড় ; দেখে মনে হয় কেউ কোনোদিন থাকে নি। কিন্তু এই হল সেই কোলিল্লা আর তার মেয়ের রাতের অভিসারের জায়গা, প্রায় একরকম দেখতে দুজন— ফরসা, সুন্দর, সবসময় একরকমের কালো বেশ। এই সেই নালা, এইখানে পিনিতো মরে পড়েছিল দুটো গোটা দিন, কারোর নজরে পড়ে নি। সৈন্যরা এসেছিল যখন, কামান এনে বসিয়েছিল এইখানটাতে। এইখানে পরম নিশ্চিন্তে চোরা-চোলাই মজুত করে রেখেছিল ডন ইগনাশিও। কেবল কি তাই, এই এখান দিয়েই আঙ্গুস্তিয়াস থেকে ষাঁড়গুলো এসে ঢোকে আমাদের শহরে। দেখেছিস অল্পবইসী ছেলেপুলে অবধি চার ধারে কোথাও নেই !

খালপোলের মাথার আড়া বেয়ে শুকিয়ে আসা লালচে আঙুরলতা, পেছন দিয়ে দেখা যাচ্ছে ইটভাঁটা, বেগনি সোঁতার উঁকিঝুঁকি। দেখ কী নির্জন জলাগুলো ! দেখ অস্ত যাচ্ছে সূর্য— বিশাল রক্তবর্ণ দেখা-দেওয়া দেবতার মতো, দিকদেশজোড়া দিব্যোন্মাদ উপচার হরণ করে নিয়ে ওয়েলভার পেছনে ক্ষীণ সমুদ্ররেখার অনন্ত স্তব্ধতার মধ্যে ডুবতে বসেছে— জানিস প্লাতেরো, ওই যে নিঃশব্দ, ও আমাদের এই মোগেরের, তার গ্রামপল্লীর, তোর আর আমার সবার মিলিত অর্ঘ্যউপচার।

ছুটি ফুরিয়ে এল। নতুন হলুদ-কুঁড়ি পাতা একটা-দুটো ফুটেছে কি ফোটে নি, ইশকুল খুলে গেল, ছেলেরা চলে গেল। নির্জন। ঘরের ভেতর সূর্যের আলো হা হা করছে। মনের ভেতর কল্পনায় বাজছে অনেক দূরের ডাকাডাকি চেঁচামেচি, হাসিকলরোল।

ফুটন্ত গোলাপগুচ্ছের ওপর তিল তিল করে অবসিত হয়ে এল অপরাহ্ন। শেষ গোলাপটার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে দিনান্তরশ্মি, দেখতে দেখতে গোটা বাগানটা দাউদাউ সুবাসশিখার মতো জ্বলতে জ্বলতে সূর্যাস্তবহ্নির দিকে এগিয়ে চলেছে, চার ধার জুড়ে শুধু পোড়া গোলাপের গন্ধ। স্তব্ধতা।

আমার মতন প্লাতেরোও ক্লান্ত এই একঘেয়েমিতে, জানে না কী করা এখন। এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসে আমার কাছে, দ্বিধা করে এক মুহূর্ত, শেষ অবধি সপ্রত্যয়ে আমারই সঙ্গে এক সাথে ঢুকে পড়ে বাড়ির ভেতর।

দেখ, দেখ প্লাতেরো, মানুষের লোভ আর স্বার্থ মিলে কী হাল করেছে নদীর— ভুই খনি-এলাকার মাঝখানে একেবারে নালার আকৃতি হয়ে আছে। বেগনি হলুদ কাদাপাঁকের এক-আধখানে ও যে সূর্যাস্তকে ঠিকরে তুলবে এমনি ঘোলাজলও সামান্যই আছে আজ বিকেলে; যেটুকু জল খাতে বইছে তাতে খেলা-নৌকো চলতে পারে বড়ো জোর। কী দুরবস্থা!

আগে আগে মদের কারবারিদের বড়ো বড়ো ভড় নৌকো— ক্যাটবোট ব্রিগাণ্টায়িন, ফেলুকা: 'নেকড়ে', 'তরুণী এলোয়সা', 'সাধু গায়তান' এই ধারার সব নাম— শেষখানা আমারই বাবার নৌকো, বেচারা কিন্‌তেরো ছিল তার কাপ্তেন, আমার কাকার ছিল 'তারা' বলে নৌকোখানা, তার কাপ্তেন ছিল পিকোন— যেন আকাশ ভরাট করে এলোমেলো সুখের বিশৃঙ্খলা জমিয়ে তুলত তাদের বড়ো পাল ছোটো পাল— ছেলেপুলেদের কাছে সে এক বিস্ময়!— নয়তো মদ বোঝাই দিয়ে ভারে ডেবে সে সব নৌকো পাড়ি দিয়ে চলত মালাগা, কাদিৎ, যেত হিব্রালতার।··· তার ভেতর লঙ্কগুনো ঢুকে পড়ে— গ্রিজ মাখানো আংটা, তাদের সব পীর মূর্তি, সবজে নীল হলুদ সিঁদুরে রঙে পেণ্ট-করা নামধাম নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলত জলের গতি।··· আর মেছুয়ারা মাছ নিয়ে আসত শহরে: সার্ডিন ঈল সোল কাঁকড়া-ঝিনুক··· রিয়ানতোতোর তাঁবা খেয়ে খেয়ে জল বিষাক্ত করে দিয়েছে সব-কিছুকে। একটা সুদিকও দেখছি রে তাইতে প্লাতেরো, বড়োলোকেদের পেটে ভালো ছাড়া সয় না বলে গরিবরা আজকের এই খারাপ মাছটা তবু খেতে পাচ্ছে।··· কিন্তু সেই যে সব ফেলুকা ব্রিগাণ্টায়িন ক্যাটবোট— সে সব চিরতরে চলে গেল।

কী দারিদ্র্য! খৃষ্টের ওই মূর্তি বড়ো বানের সে জোয়ার আর দেখতে পায় না। পড়ে আছে, শুধু একটা মরামানুষের— হতগরিব খড়িওঠা হাড়সার ভিখিরি— তারই ক্ষীণ সুতোর মতো একটা রক্তের ধারা— রক্তহীন নদী, আজকের এই লাল সূর্যাস্তের মতো লোহা-রঙ্‌ধরা, আর তারই পটভূমিকাতে হাল-পাল-চাল-সাজ খুলে নেওয়া 'তারা' বলে নৌকোখানার ভাঙা-ধসা কালো তলির দাঁড়াটি উঁচিয়ে আছে দেখ আকাশের দিকে। মাছের কাঁটার মতো ভেতর-খোলটাতে এখন চৌকিদারের ছেলেমেয়েরা খেলা করে— অবিকল যেমন আমার বুকের ভেতর খেলছে আমার সব আশা-প্রত্যাশা, সেইরকম।

এমনি নির্জন জায়গাটা যে সবসময় মনে হয় ওই যেন কেউ আসছে। বন থেকে ফেরার পথে শিকারিরা এখানটায় এসেই তাড়াতাড়ি পা চালাতে শুরু করে— কাঠের বেড়াপাঁচিল বেয়ে উঠে ভালো করে চার পাশে নজর করে নেয় দূর অবধি। সবাই বলে ডাকাত পারালেস এ অঞ্চলে ডাকাতি করতে এসে এইখানেই রাতের আস্তানা গাড়ত। লাল টিলাটা যেন উদয়সূর্যের পটে কে লিখে রেখেছে, টিলার মাথায় কখনোসখনো সন্ধ্যের মুখে হলদে চাঁদের আলোয় ছবির মতন একটা পালছাড়া ছাগল। মাঠের মধ্যে পুকুর, অগস্ট পড়লে যেটা শুকিয়ে আসতে থাকে, হলদে সবজে গোলাপিনা আকাশের ছোপ জড়ো করতে থাকে জলে, কিন্তু ঘরখেদানো ছেলেদের ঢিল-ছোঁড়া ব্যাঙবাজি খেলার ঠেলায় এখন প্রায় বুজে এসেছে।

বাঁকের গোড়ায় এসে মাঠের মুখ-আগলানো খরুবা গাছটার পাশে দাঁড় করালাম প্লাতেরোকে, শুকনো কালো শুঁটিসুদ্ধু ডাল নুয়ে আছে মাথায়, হাতের পাতাদুটো মুড়ে শাঁখের মতন মুখে নিয়ে টিলাপাহাড়ের দিক লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠলাম :

'প্লা তে রো !'

'পরুষ পাথুরে সাড়া জলের কাছ দিয়ে আসতে গিয়ে একটু নরম হয়ে উঠল :

'প্লা তে রো !'

চমকে উঠে ফিরে তাকাল প্লাতেরো, মাথাটা তুলে যেন কিছুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ফাঁক খুঁজছে, ছুটে পালাবার প্রবল আবেগ নিয়ে কাঁপছে দাঁড়িয়ে।

'প্লা তে রো !' আবার চেঁচিয়ে উঠলাম টিলার দিকে মুখ করে।

পাহাড় সাড়া দিয়ে উঠল আবার : 'প্লা তে রো !'

প্লাতেরো একবার আমার দিকে চায়, একবার পাহাড়ের দিকে, তারপর ওপর-ঠোঁটে জিভটা বুলিয়ে নিয়ে দীর্ঘ হ্রেষা তুলল দিগন্তআকাশের দিক লক্ষ্য করে।

মুখে হাত-চাপা দিয়ে পাহাড় সাড়া দিয়ে উঠল ফের পিঠোপিঠি— সমান টানা হ্রেষা ডাক, আরো প্রলম্বিত সমের মুখটা।

প্লাতেরো ডেকে উঠল আবার।

টানা হ্রেষা বাজতে লাগল ফের-আবার পাহাড়ে পাহাড়ে।

ঝড়বাতাসের মতন পাগলা হয়ে উঠল প্লাতেরো, ঘাড়-মাথা ঝাঁকিয়ে পা দাপিয়ে খুঁটো উপড়ে আমায় ফেলে পালাতে উদ্দাম— শেষে, কত আদরসোহাগের কথা বলে তবে শান্ত করি। আস্তে আস্তে কতক্ষণে যে তার ডাক আবার তার নিজের— ক্যাকটাস-ঘাসের চত্বরে কেবল তার নিজের ডাকটুকু হয়ে দাঁড়াল অবশেষে !

ঊষা

শীতের মন্থর নিশান্তবেলায় সজাগ কুঁকড়োটা যখন ঊষাভোরে প্রথম অরুণগোলাপের ফুটে ওঠা দেখে উদাত্ত বরণবন্দনা পড়ে ওঠে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্লান্ত হয়ে প্লাতেরোও ডেকে উঠেছে টানা দীর্ঘ ডাক। আমার জানলার খড়খড়ি গলে ঢুকে আসা নীলিমাআলোর ভেতর কী সুন্দর লাগে ওর ওই দূর থেকে ডেকে ওঠার সাড়াটুকুনি। নরম বিছনার মধ্যে শুয়ে শুয়ে আমিও ব্যগ্র হয়ে ভাবতে থাকি ভোরের সূর্যের মুখখানা।

আরো ভাবতে থাকি আমার ওই দুঃখী প্লাতেরো— ওর কী হাল হত যদি কবির হাতে না পড়ে ও পড়ত কাঠকয়লাপোড়ানির হাতে, রাত থাকতে শূন্য রাস্তার উষ মাড়িয়ে জঙ্গলে যায় যারা পাইনকাঠ চুরি করে আনতে, কিংবা যদি পড়ত ও হতভাগা বেদেদের ঘরে যারা রঙ দিয়ে চিত্রিবিচিত্রি কাটে গাধার গায়ে, সেঁকো বিষ খাইয়ে কানে ছুঁচ বিঁধিয়ে খাড়া রাখতে চায় যাতে সে ঝিমিয়ে না পড়ে।

আবার ডেকে উঠল প্লাতেরো। ও কি জানতে পারে আমি ওরই কথা ভাবছি ? জানুক গে, আমার কী বা তাতে এসে যায়। প্রথম আলগা আলোর মধ্যে ওর ভাবনা এই সকালবেলাটার মতোই ভালো লাগছে। ওর ওই আস্তাবলটাও যে খাটের বিছনার মতন উষ্ণনরম, আর আমার এই ভাবনার মতন শুভ-সৌহার্দ্যে ভরা, ভাবলেও ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ লাগে।

আয়, আরো এগিয়ে আয় প্লাতেরো। এখানে তোর কোনো আদবআদত দেখাতে হবে না। এ বাড়ির মালিক তুই এসেছিস তাতেই খুশি, তোর আপনার বলতে তো উনিও। ওঁর কুকুর আলীটাও তো জানিস তোকে ভালোবাসে। আর আমার কথা, সেও কি তোকে বলতে হবে রে প্লাতেরো? কমলাবাগানে এখন কী রকম হিম বল তো! ওই শোন রাপোসো কী বলছেন: 'ভগবানের ইচ্ছে আজ রাতে বেশি কমলা না নষ্ট হয়।'

আগুন ভালোবাসিস নে তুই, প্লাতেরো? আমার কী মনে হয় জানিস? একটা উলঙ্গ মেয়েমানুষের শরীরেরও আগুনের সঙ্গে তুলনা হয় না। এই যে জ্বলন্ত নগ্নতা— এর সঙ্গে কিসের বওয়া-চুল, কোন বাহু-নাল, কোন বা করভ-উরতের তুলনা, বল? বোধ হয় আগুনের চেয়ে বড়ো কিছু প্রকাশ প্রকৃতিরও নেই। বন্ধ বাড়ি, বাইরে রাত, নিঃসঙ্গ; তবু দেখ পাতালদেবতার গুহার মুখে দাঁড়িয়ে আমরা ওই গ্রামপ্রান্তরের চাইতেও প্রকৃতির কত কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছি। আগুন হল ভেতর-বিশ্ব। ক্ষতনিঃসৃত রক্তের মতন আরক্ত, ক্ষান্তিহীন; রক্তের সমস্ত বিজড়িত স্মৃতির মতন তাপ দিতে থাকে, বল দিতে থাকে আমাদের নিরন্তর।

আগুন কত সুন্দর, বল প্লাতেরো। ওই দেখ আলী ওর গা-টা প্রায় ঝলসে ফেলছে; দেখ, জ্বলজ্বলে বড়ো বড়ো চোখদুটো মেলে কেমন দেখছে চেয়ে চেয়ে। সুখ ব'লে সুখ! সোনার ঝুরি ছায়ার ঝুরি নাচছে আমাদের ঘিরে ঘিরে। গোটা বাড়িটা নাচছে— এইটুকু হয়ে যাচ্ছে লঘু ছন্দে নাচতে নাচতে, পরক্ষণেই বিশাল হয়ে উঠছে— কসাক্ নাচিয়েদের মতন। আগুনের ভেতর থেকে বের হয়ে হয়ে আসছে যত হতে পারে সমস্ত সম্ভাব্য রূপ— অন্তহীন ইন্দ্রজালের কূটকলায় বনে-ওঠা পাখির পাঁতির সঙ্গে ডালপাতামঞ্জরী, কেশরীসিংহ আর জলের ঝর্না, টিলাপাহাড় আর গোলাপগুচ্ছ। দেখ আমরাও নাচছি, না জেনে না নেচে দেয়ালে মেঝেয় ছাদের মাথায়, দেখ আমরাও নেচে চলেছি।

কী উন্মাদ, মাতাল সুখের গৌরব! দেখ প্লাতেরো, এখানে ভালোবাসাও দেখ ঠিক অবিকল মৃত্যুর মতন দেখতে!

তারাকুচি ফুল

মা-কে

মাদার তেরেসা যখন মারা গেলেন, মা বলেছেন, ফুলের প্রলাপ বকতে বকতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আমি তখন খুবই ছোটো, আমার সেই অল্পবইসী স্বপ্নের রঙচঙে তারার কুচির সঙ্গে কিসের মিলে জানি না রে প্লাতেরো, যখনই তাঁর মরবার কথা মনে হয়, মনে হয় তাঁর মরার সময়কার সেই প্রলাপের ফুলগুলো ছিল সব বেগনি গোলাপি নীল ভার্বিনা-র ফুল।

বারান্দার ঝরকার যে রঙিন কাঁচের ভেতর দিয়ে চাঁদ-সূর্যকে দেখতে পাই লালরঙের, নীলরঙের, কিংবা তার নীল ফুলের টবের, কাঁদার শাদা দাগের ওপর দিয়ে ঝুঁকে আছে একগুঁয়ের মতন, সেই তারই ভেতর দিয়ে শুধু মাদার তেরেসা-র স্মৃতি মনে পড়ে। অগস্টের দুপুর রোদ হোক কি সেপ্টেম্বর মাসের ঝড়বাদলার দিন হোক— মুখটা দেখায় না কক্‌খনো, কেন না আমারই তো মনে নেই কেমন দেখতে ছিল তাঁকে।

জানিস প্লাতেরো, মা বলেন, প্রলাপের মধ্যে উনি বারবার কে এক অদৃশ্য মালীর নাম ধরে ডাকছিলেন। সে মালী যেখানকারই হোক নিশ্চয় ওঁকে শান্ত হাত ধরে, ফুলের পথ ধরে— রাশি রাশি ভার্বিনা ফুলের পথে নিয়ে গেছে। ওই পথ ধরেই তো উনি আসেন ফের আমার কাছে, আমার স্মৃতির ভেতর, আমার ভক্তিঅনুরাগের কথা ভেবে ওঁর তুল্য করেই ওঁকে সাজিয়ে নিয়াসে— আমার এই হৃদয়মণ্ডলের সম্পূর্ণ বাইরেটায় যদিও; বাগানের ঝরা গাঁদা আর আমার ছোটোবেলাকার সেই রাত-জোড়া তারার কুচির সহোদরার মতন ছোটো ছোটো ফুলের চুমকি ঢালা যেমন ওঁর পরনের উৎকৃষ্ট পট্টবাস, ঠিক সেইরকম।

রিবেরা স্ট্রিট

এখন যেটা গ্রামরক্ষীবাহিনীর ব্যারাক, বিশাল ওই বাড়িটাতে আমি জন্মেছিলুম রে প্লাতেরো। কী ভালো যে লাগত ছেলেবেলায়, একহারা বারান্দাটা লাগত যেন রাজবাড়ির বারান্দার মতো, রঙিন কাঁচের তারাকুচি বসানো, প্রফেসর গারফিয়ার ধাঁচে ম্যুর শৈলিতে তৈরি। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে তাকা প্লাতেরো, ছেলেবেলায় তখন মুগ্ধ হয়ে দেখতুম, ভেতরের খোলা উঠোনটার পেছন দিয়ে বয়েস-খাওয়া কালো কাঠের ওই যে রেলিং— আজও সে শাদা আর ল্যাভেণ্ডার রঙের লাইলাকে ঘণ্টাফুলে যেন সেজে রয়েছে।

বিকেলবেলা হলে জুটত এসে যত সব জাহাজি মাল্লারা, ফ্লোরেস স্ট্রিটের ওই কোণাটাতে এসে দাঁড়াত, সতেরোরকম নীলের পটি বসানো বসানো পোশাক, ঠিক যেন আল দেয়া দেয়া কার্তিকমাসের মাঠ। মনে পড়ে মস্ত বিরাট মনে হত লোকগুনোকে, জাহাজিদের ধরনে তাদের এতখানি ফাঁক করা দুটো পায়ের মধ্যে দিয়ে দেখতে পেতাম অনেক দূরে তলায় বওয়া নদী, জল আর বালির দাগ দাগ পরে পরে— একটা দাগ জ্বলছে ঝলমল করে, আরেকটা শুকনো হলদে, একেবারে ওপারের কিনারা দিয়ে একটা নৌকো চলেছে মন্থর হয়ে, পেছনের সূর্যাস্ত-আকাশটাতে ছিটকে লেগে আছে হিংস্র লাল রঙ··· পরে বাবা বাসা বদলে উঠে গেলেন কাল্লে ন্যুয়েভাতে, কেন না ওখানে দিবারাত্র সে মাল্লাদের ছুরি-মারামারি, উটকো ছেলেগুনো প্রতি রাতে ভেঙে যাচ্ছে গেটের ঘণ্টা আর বাতি, তা বাদে ওই কোণদিকটা দিয়ে দিনরাত ঝোড়ো বাতাস···

ঘেরা বারান্দার ঝরকা দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়। আর সে রাত্রিটা কখনো ভুলব না, সেই আমাদের, ছেলেমেয়েদের, নিয়ে যাওয়া হল সব দোতলাতে, ভয়ে কাঁপছি আর দেখছি বালির বাঁধের ওপরে চড়ে এসে একটা ইংরেজ জাহাজ জ্বলছে দাউ দাউ করে···

ভগবান তাঁর ফটিক প্রাসাদের অন্দরে। মানে, বৃষ্টি হচ্ছে। দেখেছিস প্লাতেরো, বৃষ্টি হচ্ছে। শেষ যে-কটা ফুল ফেলে গিয়েছিল শরৎ, নিষ্প্রাণ ডালপালা আঁকড়ে ঝুলছিল মরীয়া হয়ে, দেখ, হীরের কুচিতে ছেয়ে গেল। প্রত্যেকটা হীরের টুকরোতে একখণ্ড করে আকাশ, ফটিক পুরী এক-একখানা, দেবতা একজন। দেখ ওই গোলাপগুলোকে দেখ : ভেতরে আরেকটা করে তরল গোলাপ, দেখেছিস? যেই নাড়া খেল অমনি অপরূপ নতুন ফুলটা ঝরে পড়ল ভেতর থেকে— যেন ও ওই গোলাপের অন্তরাত্মা, দেখ কেমন আর্ত আহত হয়ে পড়ে রয়েছে এখন, ঠিক আমার আত্মার মতন।

সূর্যকিরণের মতন ঝলমল করে ওঠা উচিত বৃষ্টিরও, মনে হয় না তোর? যদি না হয় তো দেখ ওই দুরন্ত, গোলাপের মতো বাচ্চাগুলো খালি-গায়ে মহা আনন্দে হুটোপুটি করতে নেমেছে কিভাবে বৃষ্টির ভেতর। দেখ, রাজ্যের চড়ুই ঝটপট করতে করতে ঢুকে পড়ল মাধবীলতার ঘরে— ওদের ইশকুলবাড়ি যে— আমার না রে, তোরই দারবোন-ডাক্তারের কথা।

বৃষ্টি, বৃষ্টি। আজ আর আমরা গাঁয়ে বেরোবো না। আজ বসে শুধু ভাবব। দেখ ওই চালের নালা বেয়ে জল চলেছে সউচ্ছ্বাসে, দেখ কেমন তকতকে ঝলমল হয়ে উঠল একেশিয়া ফুল— কালচে, একটু একটু সোনার আভা লেগে এখনো; ছেলেদের এইটুকুটুকু নৌকাগুলো দাম-পানায় বেধে ছিল, ছুটেছে দেখ তরতর করে নালা বেয়ে। এই মুহূর্তের দুবলা অরুণ আলোয় কী অপূর্ব লাগছে ওই রামধনু— গির্জার মাথার থেকে উঠে আমাদের এইখানটাতে স্রস্ত আবছায়া হয়ে গেছে।

স্বচ্ছ রাত

ঠাণ্ডা তারা-জ্বলা নীল আকাশের গায়ে খোদা শাদা জাফরি ছাদ। নিঃশব্দ উত্তুরে বাতাস ধার হাত বুলিয়ে যাচ্ছে।

শহরসুদ্ধু সবাই ভাবছে ভারি শীত, তাড়াতাড়ি দোর-কপাট বন্ধ করে যে যার ঘরে সেঁদিয়ে পড়তে ব্যস্ত। শুধু তুই আর আমি, প্লাতেরো, এখন ওই জনমানুষহীন ঝকঝকে শহরের পথ ধরে ধরে চলব, খুব আস্তে আস্তে— তোর ওই গায়ের পশম-রোঁয়ার ওপরে আমার ভারি কোটের ওম্, আর আমি গরম হয়ে আছি আমার প্রাণের উত্তাপে।

ভেতর থেকে যেন একটা তীব্র তেজ আমায় তুলে ধরেছে— এবড়োখেবড়ো চাঙড়াপাথরে-গড়া যেন একটা মিনার আমি, চুড়োয় সূক্ষ্ম রুপোর জালি করা। দেখ প্লাতেরো, কত তারা, আকাশ ভর্তি তারা! এত অসংখ্য অসংখ্য তারা যে মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে! যেন দীপমালা ধরে পৃথিবীর কানে ভালোবাসার মন্ত্র পড়ছে আকাশ।

প্লাতেরো, প্লাতেরো! আমার এই জীবনটা দিয়ে দিতে পারি রে এই স্বচ্ছ, একলা, কঠিন, দীপান্বিতা রাতটুকুর জন্যে। জানি, তুইও পারিস।

মৌরির মুকুট

'দেখি কে পৌঁছতে পারে আগে !'

প্রাইজ হল একখানা ছবির বই, সবে কালকে পেয়েছি ভিয়েনা থেকে।

'দেখি কে আগে ছুঁতে পারে গিয়ে ভায়োলেটগাছটা ! এই এক··· দুই··· তিন··· !'

ছেলেরা ছুটল হুল্লোড় করে, হলদে রোদের ভেতরে গোলাপি আর শাদায় জড়াজড়ি সুখকলরব। এক মুহূর্তে, তাদের বোবা ওঠাপড়া বুকের শ্রান্তিতে সকালবেলাতে গড়ে উঠেছে যে স্তব্ধতা, তার মধ্যে শোনা যায় ছোটো ছোটো মুহূর্ত বেজে চলেছে বুরুজের ঘড়িতে, পাইনপাহাড় থেকে ভেসে আসছে একটা মশার এক ফোঁটা ক্ষীণ গান, যে পাহাড়ের এধার ওধার খালি নীল রঙের লিলিফুল আর লিলিফুল আর আসাযাওয়া জল··· ছেলেরা পয়লা কমলাগাছটা অবধি গেছে কি না, একপাশে পড়ে আলসেমি করছিল যে প্লাতেরো, খেলার ছোঁয়াচ পেয়ে সেও উঠে দড়বড়ি ছুটতে শুরু করে দিলে তাদের সঙ্গে। ছেলেরা ছুটছে না-হারে যাতে, প্রাণপণ— বাধা দেয়ার, চাই কি হেসে ওঠবার ফুরসুৎও তাদের নেই···

পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠি, 'প্লাতেরো জিতছে ! প্লাতেরো জিতছে !'

তাই হল। কেউ যাবার আগেই প্লাতেরো পৌঁছে গেছে ফুলগাছটার গোড়াতে, থেমে দাঁড়িয়ে তারপর গড়াতে লেগেছে ফের বালির ওপর।

ছেলেরা প্রতিবাদে চেঁচাতে চেঁচাতে ফিরছে সব— মোজা টেনে তুলতে তুলতে, চুল উলটে ফেরাতে ফেরাতে।

'হবে না ! হবে না ! না ! না ! ও হবে না।'

বললুম, কেন, দৌড় জিতেছে প্লাতেরোই, দিতে হয় তো প্রাইজ ওকেই দিতে হয় কিছু-একটা। তবে প্লাতেরো তো পড়তে পারে না, বইটা তোলা থাক তা হলে আরেকটা দৌড়ের জন্যে, কিন্তু প্লাতেরোকে একটা প্রাইজ দিতেই হয়।

বইটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে ছেলেরা ফের লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে উল্লাস করে চেঁচাতে শুরু করে দিল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ !'

তখন, নিজের কথাটিও ভেবে, মনে হল প্লাতেরোর তো নিশ্চয় প্রাইজ পাওয়া উচিত দৌড়ের জন্যে, যেমন আমারও সে পাওয়া উচিত আমার কবিতার স্বাদে। বাড়িওলার দোরগোড়া থেকে মৌরিফুল তুলে মুকুট বানালুম একটা, মাথায় পরিয়ে দিলুম তার, লাকেদেমনীয়ানদের পাওনা একটাবারের প্রথম পুরস্কারের মতো।

কষ্ট হচ্ছে রে প্লাতেরো··· শোন বলি ; পোর্‌তাদার কাছে ফ্লোরেস স্ট্রিটের রাস্তাটা পার হচ্ছিলাম, সেই যেখানে বাজ পড়ে মারা গিয়েছিল রে যমজ বাচ্চাদুটো, দেখি সোর্দোর শাদা ঘুড়ীটা মরে পড়ে রয়েছে। আর, প্রায়-উদোম কতকগুলো বাচ্চা মেয়ে ঘুরছে তাকে ঘিরে।

সেই যে দর্জি-মেয়ে, পুরিতা, সে আসছিল রাস্তায়, বলল, ঘুড়ীটাকে খাইয়ে খাইয়ে তিতিবিরক্ত হয়ে, আজই সকালে সোর্দো তাকে দিয়েসেছিল খোঁয়াড়ে। জানিস তো, বেচারা জানোয়ার— যেমনি বুড়ো তেমনি নিরেট বোকা— ঠিক আমাদের বাবুজি হুলিয়ান। দেখতেও পায় না, শুনতেও পায় না, হাঁটতেও জড়িয়ে পড়ে··· দুপুর নাগাদ ঘুড়ী ফিরে এল মালিকের উঠোনে। রেগে গিয়ে আঙুরলতার একটা শক্ত ঢ্যাঙাকাঠ তুলে নিল ও, ঘুড়ীটাকে তাড়াতে গেল লাঠির বাড়ি দিয়ে। কিছুতে সে যায় না। তখন, ছিল কাস্তেটা, তাই দিয়েই দিলে কেটে। লোক জমে গেল। লোকের গাল আর বিদ্রূপের চোটে ঘুড়ী উঠে লেঙচে টক্কর খেতে খেতে চলল রাস্তা ধরে। ছেলের পাল চলল পেছন পেছন চেঁচাতে চেঁচাতে আর ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে। অবশেষে সে পড়ে গেল মাটিতে, আর সেখানেই তখন ওকে মারা সমাধা করলে সব। কারো কারো সমবেদনার বাক্যও ওড়াউড়ি করলে ওর ওপর দিয়ে : 'দাও না, শান্তিতে মরতে দাও না বেচারাকে!' যেন তুই বা আমি আছি রে প্লাতেরো, তবু সে যেন ঝঞ্ঝাঝড়ের মাঝকেন্দ্রটাতে একটা প্রজাপতি।

আমি যখন দেখলুম, দেখি ঢিল-পাথর স্তূপ হয়ে আছে পাশে, আর তাদেরই মতন শান্ত, ঠাণ্ডা হয়ে ও পড়ে আছে। একটা চোখ বিস্ফার হয়ে খোলা, জ্যান্তে যে অন্ধ ছিল যেন মরার পরে দেখতে পাচ্ছে সব স্পষ্ট। অন্ধকার রাস্তায় একটাই আলো যেন ওর শাদাটুকুনি, ঠাণ্ডার ভেতরে অনেক উঁচু রাতের আকাশের তলায় আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে, হালকা নির্ভার পশমরোঁয়ার মতো গোলাপের রঙা মেঘের কুচি পড়ে পড়ে ঢেকে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে।

তিন রাজা

রাতে ছেলেদের সে কী উত্তেজনা রে প্লাতেরো! কিছুতে শুতে পাঠানো যায় না। শেষ অবধি অবিশ্যি সব ঘুমে অচৈতন্য— কেউ ইজিচেয়ারে, কেউ আগুনপোয়ানি চিমনির কোণায় মেঝেতে। ব্লাঙ্কা নিচু চেয়ারে, পেপে জানলার নীচ-পৈঠেটায়— মুখ সব দোরমুখো, পাছে রাজারা এসে চলে যান।··· আর এখন জীবনের বার-মহলের তলায় জাদুময় ওদের পুরো ঘুমটুকু পুঙ্খপুঙ্খ করে অনুভব করতে পারি, পূর্ণ দৃপ্ত মস্ত একটা হৃৎপিণ্ডের মতো ঘা দিয়ে দিয়ে চলেছে।

রাতে খাবার আগে আমিও ওদের দলে পড়ে ওপরে গিয়েছিলুম। সিঁড়িতে সে কী আওয়াজ, অন্য রাত হলে ওরা নিজেরাই ভয় পেয়ে যেত সে আওয়াজে!

'পে পে! আকাশের দিকে চাইতে আমার একটুও ভয় করছে না! তোর?' ব্লাঙ্কা বলছে শক্ত করে আমার হাতটা চেপে ধরে।

সব্বার জুতো রেখে গেলুম মেওয়াফলের ভেতর, বারান্দায়। প্লাতেরো, এবারে আমরা লেপ-কাঁথা-পুরোনো টুপি-টুপি পরে সাজতে যাচ্ছি— মন্‌তেমায়োর, তিতা, মারিয়া তেরেসা, লোলিল্লা, পেরিকো, তুই, আর আমি। বারোটার সময় পেছনবাড়িতে ছেলেদের জানলার সামনে দিয়ে আলো জ্বালিয়ে ঢাক বাজিয়ে শিঙা আর শাঁখ ফুঁকতে ফুঁকতে সঙ সেজে শোভাযাত্রা করে আমরা যাব। তুই যাবি আগে আগে আমার সঙ্গে, আমি হব কাস্‌পার, শাদা তুলোর দাড়ি পরে নেবো একটা, আর তোকে কম্বলের মতো করে জড়িয়ে দেবো কলম্বিয়ার ফ্ল্যাগটা— সেই যেটা, রাষ্ট্রদূত ছিলেন আমার কাকা, তাঁর বাড়ি থেকে নিয়েসেছিলুম।··· ছেলেরা হঠাৎ জেগে উঠে ঘুমোবার জামা পরেই কাঁপতে কাঁপতে উঁকি দিয়ে দেখবে গিয়ে শাশির ভেতর থেকে বাইরে, তাদের বিস্মিত চোখে তখনো ঘুম লেগে। এরপর আমরা ওদের ঘুমের ভেতর চলতে থাকব ভোর অবধি, যতক্ষণ না দিন হয় কালকে— বেশ খানিকটা বেলাতে যখন নীল আকাশ খড়খড়ির ভেতর দিয়ে ঢুকে ধাঁধিয়ে দিতে থাকবে ওদের, আধাজামা-পরা অবস্থাতেই ওরা ছুটে যাবে বারান্দায় যাবতীয় ঐশ্বর্যের দখল নিতে।

স্পেনীয় তিন রাজা হলেন সান্তা ক্লসের তুল্য।

দেখ, প্লাতেরো। মাপা দৌড় ছোটা সার্কেসের ছোটো ঘোড়াটার মতন ও ও তিনবার পাক দিয়ে এসেছে বাগানে, আলোর কোমল সমুদ্রের যেন একটা ছোট্ট শাদা ঢেউ, ফের ছুট দিয়ে গেছে বাগানের পাঁচিল পার হয়ে। মনে মনে দেখছি ও-ধারের বুনো গোলাপের ঝাড়ে ও আলো ফেলতে ফেলতে ছুটেছে— দেয়াল ভেদ করে প্রায় চোখের ওপরে দেখতে পাচ্ছি মনে হয়। দেখ। ওই যে ফিরে এসেছে ফের। আসলে দুটো প্রজাপতি সত্যিকার, একটা শাদা— সে : ল সে নিজে; আরেকটা কালো, সে তার ছায়া।

একধরনের পরম সুন্দর রূপ আছে রে প্লাতেরো, আর-সব সুন্দর তাকে বৃথাই ছাপা দিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। যেমন তোর ওই চোখদুটো তোর মুখের সবচাইতে সুন্দর, যেমন রাতের তারা, যেমন ভোরবেলার বাগানে ওই গোলাপ আর প্রজাপতি।

দেখ প্লাতেরো, কী সুন্দর উড়ছে! উড়তে নিশ্চয় ওর ভারি আনন্দ। আমার আনন্দ যেমন কবিতাতে। ওর সমস্ত সত্তা ওর ওই ওড়ার মধ্যে— ওর আপনা থেকে ওর আত্মা— সব। দুনিয়ায়, অর্থাৎ ওই বাগানের আর-কিছুতে আর ওর আসে-যায় না।

শ্‌শ্‌শ্‌, চুপ, প্লাতেরো··· দেখ। কী শুদ্ধ নির্মল দাগলেশহীন হয়ে উড়ছে দেখ, ওকে অমন উড়তে দেখতে কী কত সুখ!

দেখলুম প্লাতেরো শুয়ে আছে তার খড়ের বিছানাতে, কোমল বিষণ্ণ চোখতুটো। কাছে গেলুম, গায়ে বিলি দিয়ে দিলুম, ডেকে কথা বললুম, ওঠাতে চেষ্টা করলুম চার পায়ে…

ঝটপট করে গা ঝাঁকিয়ে খাড়া হতে গেল বেচারা, এক-হাঁটু ভর করে উঠল… পারল না… মাটিতে ছড়িয়ে দি ধরে পা-টা, ফের বিলি দিতে থাকি গায়ে আদর করে, তারপর খবর পাঠালুম ওর ডাক্তারকে।

বুড়ো দারবোন, দেখতে এসে সে তার অতখানি দন্তহীন চোয়ালটা হাঁ করালে কান থেকে কান অবধি, লাল মুখখানা পেণ্ডুলামের মতো দোলাতে লাগল তার বুকের ওপরে।

'ভালো বোধ হচ্ছে না, তাই না?'

জানি না কী উত্তর পেল সে… বেচারা আবোলা জীব, সে তখন মরছে… কোথায় যেন যন্ত্রণা… জানি না কোন সে বিষ মূল… ঘাসের গোড়ার যে মাটিটুকু…

তুপুর নাগাদ প্লাতেরো মারা গেল। ছোট্ট তুলোহুটি পেটটা ফুলে উঠেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মতো, আর কাঠ, বিবর্ণ পাগুলো উঁচু হয়ে আছে উর্ধ্ব দিকে। কোঁকড়া চুলগুলো পুতুলের মাথার মথে-খাওয়া পাটের গুটির মতন— আঙুল বুলোতে গেলে হেলে সরে যায় ধুলো মাখা বিষণ্ণতায়।

নিস্তব্ধ চালার ভেতর চিলতে জানলা-ফাঁক গলে আসা একটা রশ্মিরেখা— পারাপার করতে গিয়ে প্রত্যেকবারে দপ্ করে দপ্ করে জ্বলে উঠে একটা তেরঙা প্রজাপতি উড়ছে ঘুরে ঘুরে।

প্লাতেরো, দেখতে পাচ্ছিস তো আমাদের, তাই না ?

দেখছিস তো, বাগানের কুয়োজল ঝলমল করছে শান্তিতে— স্বচ্ছ, ঠাণ্ডা, এই শেষবিকেলের আলোয় দেখ— ভারি কাজের ওই মৌমাছিগুলোকে দেখ, সবুজ আর ঝিরঝিরে গোলাপি রোজমেরি ফুলের ওপরে চক্কর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে টিলার মাথায় এখনো-অবধি-লেগে-থাকা সূর্যের আলো লেগে লেগে গোলাপি সোনালি হয়ে হয়ে যাচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে !

দেখতে পাচ্ছিস তো আমাদের, প্লাতেরো ?

দেখছিস তো ধোপানীদের ছোটো ছোটো গাধাগুনো পুরোনো ঝর্নার লাল ঝুঁটির ওপর দিয়ে পার হয়ে চলেছে— পৃথিবী আর আকাশকে এক-গৌরবের স্ফটিকে মিলিয়ে তোলা এই বিশাল শুদ্ধতার ভেতর কেমন ক্লান্ত পঙ্গু বিষণ্ণ লাগছে প্রাণীগুনোকে !

প্লাতেরো দেখতে পাচ্ছিস তো আমাদের, তাই না ?

দেখছিস তো চকিত ছুটে এসেছে ছেলেরা বুনো গোলাপঝাড়ের মাঝখান দিয়ে— ফুলগুনো যেন ডালে ডালে উড়ে বসা রক্ত-বুটি দেওয়া হালকা স্বভাবের ঘুরে-বেড়ানো শাদা প্রজাপতির একটা দল !

দেখতে পাচ্ছিস তো আমাদের, প্লাতেরো ?

প্লাতেরো, সত্যিই তুই আমাদের দেখতে পাচ্ছিস, বল তাই না ? নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছিস আমাকে। মনে হয় আমিও যেন শুনতে পাচ্ছি মেঘদাগহীন পশ্চিমদিকটাতে তোর সে শান্ত গম্ভীর ডাক, পুরো আঙুরক্ষেতখানা ভরে তুলছে মধুতে মধুতে···

প্লাতেরো-কে

যে এখন মোগেরের স্বর্গে

দড়বড়ি ছুটে-বেড়ানো প্রাণের প্লাতেরো আমার, ছোট্ট প্রিয় গাধাটি আমার, কত কতবার বয়ে বেড়িয়েছিস বল আমার প্রাণটি— কেবল আমার আত্মাটিকে, শেওড়া ক্যাকটাস আর মধুলতায় ছেয়ে ওঠা গভীর সড়কে সড়কে! তোরই জন্যে এই বই যে বই তোকেই নিয়ে, যে বই এখন তুই নিশ্চয় বুঝতে পারিস।

আমাদের মোগেরের দৃশ্যপ্রাণ পাড়ি দিয়ে এ বই চলল এখন তোর আত্মার কাছে সেই স্বর্গের গোচারণে, আমাদের সে দৃশ্যপ্রকৃতিও নিশ্চয় চলে গেছে তোর সঙ্গ ধরে; তার কাগজ-পিঠে সে বয়ে নিয়ে গেছে আমারও প্রাণটুকু, ফুল-ধরা কাঁটাগাছের মাঝ দিয়ে উঠতে উঠতে দিনে দিনে ক্রমেই সে হয়ে হয়ে উঠেছে আরো ভালো, আরো শান্তিময়, আরো শুদ্ধ।

তাই নিশ্চয়। নির্জন কমলাবাগানের পথ ধরে, কমলাফুল আর ওরোপোগো-লাসের মাঝ দিয়ে, তোর শেষ নিদ্রার দিকে সজাগ চেয়ে থাকা পাইনগাছটার নীচে যখন ফিরি ভাবনামন্থর পায়ে পায়ে, তুই প্লাতেরো তোর চিরগোলাপের মাঠ থেকে পরম সুখে দেখতে পাবি— তোর গোর-চাপা বুক থেকে বেড়ে ফুটে ওঠা লিলিফুলের ঝাড়টার সুমুখে গিয়ে থেমে দাঁড়িয়েছি।